একটি সুরের কান্না

একটি সুরের কান্না

ভারতপুত্রম্

১, শ্যামাচরণ দে  স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
কবিপক্ষ ১৩৬৫

প্রকাশিকা
আভারাণী মিত্র
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শিল্পী
সমীর সরকার

মুদ্রাকর
জি. পি. সরাফ,
দি মুদ্রক মণ্ডল লিমিটেড
১৭।১, বিন্দুপালিত লেন, কলিকাতা-৬

দাম ২·৫০ ন. প.

শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন বসু

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এই গ্রন্থের গল্পগুলি ইতিপূর্বে 'ইতিহাসের ছায়াপথে' পর্যায়ে যুগান্তর সাময়িকীতে বেরিয়েছে। আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাস খুব স্পষ্ট নয়। নানা কিংবদন্তী ও লোকগাথা ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। অনেক রটনাও অনেক সময় ঘটনার মর্যাদা পেয়েছে। ইতিহাস রাজ্যের 'পরমহংস' যাঁরা তাঁরা খাদটুকু বাদ দিয়ে খাঁটি ঐতিহাসিক-তথ্য উৎসাহী পাঠকদের পরিবেশন করবেন। আমি ঐতিহাসিক নই। সে-কাজ আমার নয়। আমি শুধু বাঙলা দেশের বিভিন্ন জেলার ইতিহাস থেকে ক'টি কাহিনী বেছে নিয়ে গল্পাকারে উপস্থিত করেছি। গল্পের কাহিনী ইতিহাসের—বিন্যাস আমার। গল্পগুলিতে আমি সতর্কভাবে ইতিহাসের তথ্য ও মেজাজটিকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছি। সেদিক্ থেকে কতদূর সফল হয়েছি তার বিচারক রসিক পাঠক-সমাজ। আজ তাঁদের হাতে গ্রন্থখানি পৌঁছে দিয়েই আমি নীরবে একপাশে দাঁড়িয়ে রইলাম।

গ্রন্থখানি প্রকাশ ব্যাপারে বন্ধুবর তুলসী দাস ও অরুণ মিত্র যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছেন—তাঁদের দু'জনকে অশেষ ধন্যবাদ।

লেখক

একটি সুরের কান্না



ভোর না হতেই তৈরী হয়েছিলেন চণ্ডীদাস। দূরের পথ। সকাল সকালই বেরুতে হবে। নইলে সময়মতো গিয়ে পৌঁছনো যাবে না দরবারে। গৌড়ে। সেখান থেকে ডাক এসেছে। বাদশা নিজে গান শুনতে চেয়েছেন। চণ্ডীদাস কি আর না যেয়ে পারেন।

রামী ফুল নিয়ে মন্দিরে এলো। বললে, 'ঠাকুর, এ কি!'

'কি দেখলে?'

'সাজ-গোজ কেন? আবার কোন্ মথুরায় চললে!'

'ওঃ,' একটু হাসলেন চণ্ডীদাস। হাসিতে কপোল দু'খানিতেও রঙ ধরলো। রামীর চোখে চোখ রেখে বললেন, 'না, ভয় নেই। মথুরায় নয়, যাবো গৌড়ে। রাজদরবারে।'

'রাজদরবারে? কেন?'

'গৌড়েশ্বর ডেকেছেন। গান শোনাতে হবে।'

'গান!' বুক থেকে একটি দীর্ঘশ্বাস উড়ে গেলো রামীর। চোখ দু'টি যেন ছলছল ক'রে উঠলো। ফুলের সাজিটি আঙিনায় রাখতে রাখতে বললে, 'গান? এ গানই তোমায় পাগল করলে ঠাকুর। এ গান ছাড়া আর কিছু তুমি জানো না। কিছু তুমি বোঝ না।'

চণ্ডীদাস বললে, 'বুঝিনে? কে বললে বুঝিনে?'

'ছাই বোঝ। যদি জানতে, যদি বুঝতে···'

'তাহলে দেশে দেশে যেতুম না, গাঁয়ে গাঁয়ে ফিরতুম না, নয়?'

রামীর কথা নিজেই শেষ করেন চণ্ডীদাস। শেষ ক'রে চেয়ে থাকেন রামীর মুখের দিকে।

রামী কাঁদছে। লাল ডুগডুগ দু'খানি কপোল বেয়ে চিকচিকে দু'টি জলের রেখা নেমে এসেছে। ফুরফুরে ভোরের হাওয়ায় ক'টি চূর্ণকুন্তল উড়ে এসে লেপটে আছে তার সঙ্গে। জুঁই-শুভ্র দাঁতে পদ্মপাপড়ি-ঠোঁট চেপে হৃদয়উচ্ছ্বাসকে আটকে রাখবার চেষ্টা করছে রামী। পারছে না। বারে বারে বাঁধ ভাঙছে। সেই ভঙ্গুর-পথে হৃদয়ের চাপা আবেগ বেরিয়ে আসছে। বাঁধ-ভাঙা নদী-স্রোতের মতো। দু'টি ঠোঁট থরথর ক'রে কাঁপছে।

চণ্ডীদাস বললেন, 'কাঁদছো সখি, ছিঃ, কেঁদো না। বাশুলীর আদেশে তোমার আমার অনুরাগ। তোমার ভয় কিসের? যতদূর যাই, যেখানেই থাকি আকাশের চাঁদের মতো তুমিও আমার সঙ্গে থাকো। তোমার চোখে জল কেন?'

কেন? কে তা বুঝবে! কে তার উত্তর দেবে! রামীও তার উত্তর দিতে পারলো না। জলে-ভেজা অসহায় দু'টি দৃষ্টি তুলে সে শুধু তাকিয়ে রইলো চণ্ডীদাসের দিকে।

চণ্ডীদাস রওনা হলেন।

গান শুরু হলো রাতে।

আকাশে চাঁদ উঠেছে। মাটিতে আলোর ঢল। অগুরু-সৌরভে গৌড় দরবার ম' ম'। এপাশে নবাব ও তাঁর পার্শ্বচরেরা। বেগম-মহলে চিকের আড়ালে অনেক অনেক জোড়া চোখের ঝিলিক।

গান গাইছেন চণ্ডীদাস। শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ। বাতাসে সুরের কান্না। কথায় হৃদয়ের তাপ। চোখে চোখে অশ্রু-রেখা।

হঠাৎ চিকের আড়ালে চোখ পড়লো চণ্ডীদাসের। একজোড়া আশ্চর্য চোখ, একজোড়া আশ্চর্য কালো তারা জ্বলছে। একখানি সুন্দর মুখ চিকের শিকে ভেঙে ভেঙে আবেদনে করুণ হ'য়ে উঠেছে।

চণ্ডীদাস গাইলেন ঃ

কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে,
তাহাতে নাহিক দুখ।
বঁধু তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥

সেই মুখ সেই চোখ আরও—আরও যেন রহস্যময় হয়ে উঠলো। গান শেষ হলো। সভা ভাঙলো।

বাইরে এসেও সে-চোখকে ভুলতে পারলেন না চণ্ডীদাস। সে দৃষ্টি যেন হৃদয়ে গেঁথে গেছে, সে-মুখ যেন মনে লেগে আছে। শত চেষ্টায়ও তা মুছে ফেলা সম্ভব নয়।

মাধবীকুঞ্জে একা একা ফিরছিলেন চণ্ডীদাস। মধুমাস। ফুলের ভিড়। মলয় বাতাস। চাঁদের আলো। বাসকসজ্জিকা ধরণী। আনমনে গান ভেঁজে চলছিলেন চণ্ডীদাস। সে-সুরের মায়া কাঁপন তুলছিল মাধবীলতার পাতায় পাতায়—ফুলে ফুলে।

পেছনে কার সুরেলা কণ্ঠ ঃ 'কবি!'

চমকে উঠলেন চণ্ডীদাস। থমকে দাঁড়ালেন। ফিরে দেখলেন, চিকের আড়ালে জ্বলে-ওঠা সেই আশ্চর্য দু'টি চোখ, সেই রমণীয় মুখ। চাঁদের আলোর রূপোলী রঙে রূপের মোহ। অপূর্ব।

ধীরে ধীরে সে-মুখ কাছে এলো। পাশে দাঁড়ালো। মাথায় ছড়ানো আকাশি রঙের ওড়নাটা সরিয়ে নিল। সুর্মাটানা ডাগর ডাগর সেই আশ্চর্য দু'টি চোখ তুলে ডাকলে ঃ 'কবি!'

'বেগমসাহেবা!'

'কবি!'

'বেগমসাহেবা, আপনি!'

'তোমার গান আমায় টেনে এনেছে কবি। ও গান ছেড়ে যে আমি বাঁচবো না।'

চণ্ডীদাস নির্বাক। হাওয়া মন্থর। এবারে সেই আশ্চর্য দু'টি চোখ ছলছল ক'রে উঠলো।

জল নামলো। নরম নরম রাঙা রাঙা দু'টি গাল ভিজে গেলো।

বেগমসাহেবা বললেন, 'তুমি আমায় সঙ্গে নাও কবি। আর কিছু নয়, আর কিছু চাইনে। শুধু তোমার গান—শুধু তোমার গান শোনবার অধিকারটুকু দাও।'

'তা হয় না বেগমসাহেবা। উদাসী বৈরাগীর কণ্ঠ চণ্ডীদাসের।

'কেন হয় না কবি?'

'আপনি রাজ্যেশ্বরী, আপনার—'

চণ্ডীদাসের কথা শেষ হলো না। বেগমসাহেবা কথা কেড়ে নিলেন। বললেন, 'সব মিছে, বুঝলে কবি সব মিছে। রাজ্যে শান্তি নেই, ঐশ্বর্যে শান্তি নেই। এই বুকের তলায় শুধু জ্বালা, শুধু আগুন। তুমি আমায় শান্তি দাও কবি, তুমি আমায় সঙ্গে নাও।' বলতে বলতে দু'টি সজল দৃষ্টি চণ্ডীদাসের মুখের উপর ফেলেই আবার নামিয়ে নিলেন বেগমসাহেবা।

চণ্ডীদাস বললেন, 'আজ অনেক রাত হলো বেগমসাহেবা, অন্দরে যান। আমার কথা কাল আপনাকে শোনাবো।'

'কাল!' একটা দীর্ঘশ্বাস হাওয়ায় উড়িয়ে দিলেন বেগমসাহেবা। বললেন, 'আচ্ছা, কালই বলো। আজ তবে আসি কবি।'

বেগমসাহেবা আবার ফিরলেন। আকাশি রঙের ওড়নাটা আবার মাথায় ছড়িয়ে দিলেন। তারপর মাধবীলতার গা ছুঁয়ে রজনীগন্ধার পাশ দিয়ে দূরে মিলিয়ে গেলেন।

দু'হাতে নিজের চোখ দু'টিকেও একবার রগড়ে নিলেন চণ্ডীদাস। দু'টি চোখে বড় জ্বালা।

বেগমসাহেবাকে আর কথা বলা হলো না। সেই রাতেই গৌড় ছাড়লেন চণ্ডীদাস। ভাবলেন, বেগমসাহেবার গানের মোহ দু'দিন

পরেই কেটে যাবে। তাই হোক, তাই হোক। বেগমসাহেবার কান থেকে গানের সুর মুছে যাক। শান্তি পাক—শান্তি পাক বেগমসাহেবা।

পথে যেতে যেতে চণ্ডীদাসের মনে মনে এই প্রার্থনাটাই বেজে উঠলো।

কিন্তু গানের কথা ভুললেন না বেগমসাহেবা। ভুলতে পারলেন না। বরং তা তাঁর মনকে একেবারে আচ্ছন্ন ক'রে ফেললো। মনে মনে তিনি বললেন, 'কবি তুমি আমায় ছেড়ে যেতে পারলে কিন্তু আমি তো তোমায় ছেড়ে দিতে পারবো না কবি। তোমায় ছেড়ে যে আমি বাঁচবো না।' বলতে বলতে আবার জল নামলো সেই আশ্চর্য দু'টি চোখে। রক্তিমতর হলো সেই রক্তিম দু'খানি নরম নরম গাল।

সত্যি পারেন না বেগমসাহেবা। ঘরে থাকতে পারেন না। মাঝে মাঝেই তিনি ঘর ছেড়ে যান। ছদ্মবেশে গাঁয়ে গাঁয়ে ফেরেন। সেই গানের সুরের—সেই গানের মানুষটির অনুসন্ধান করেন। কোন কোন দিন দেখা হয়। কোন কোন দিন হয় না। যে দিন দেখা হয়, সেদিনও কাছে যেতে পারেন না। দূর থেকেই গান শুনে চোখে জল নিয়ে ফিরে আসেন। বুক ফাটে তবুও মুখ ফোটে না। মনে ভয়, তাঁকে দেখলে কবি যদি আরও দূরে চলে যায়! হারিয়ে যায় চিরদিনের মতো! তা হলে—তা হলে তিনি বাঁচবেন কি ক'রে! বাঁচবেন কি নিয়ে! তার চেয়ে এই তো ভালো। এইভাবে চুপি-চুপি মনের মানুষকে দেখে আসা। তার গানে প্রাণ ভরিয়ে আনা। যাকে চাই তাকে নাই বা যদি কাছে পাই, তা হলে দূর থেকে দেখে আসার আনন্দটা কি আর কম লাভ!

মনে মনে বেগমসাহেবা সেই কথাই ভাবেন।

বেগমসাহেবার আচরণে অবাক হয়েছিলেন বাদশা। তিনি সব বুঝেছিলেন, কিন্তু কিছু বলেন নি। ভেবেছিলেন, এ মোহ, এ চোখের নেশা, দু'দিন পরেই কেটে যাবে।

কিন্তু কাটলো না। দিন দিন বেড়ে চললো। বেগমসাহেবার অভিসারের কথাটাও একদিন জেনে ফেললেন বাদশা। জেনে ক্ষেপে উঠলেন। গৌড়েশ্বরের বেগম, তাঁর কিনা এক ভিখিরী বৈরাগীর কাছে প্রেম-প্রার্থনা! ব্যভিচার! কথাটা ভাবতে গিয়ে মাথাটা দপদপ ক'রে উঠলো বাদশার। রক্ত টগবগ ক'রে উঠলো। লাল লাল হুটো চোখ একবার যেন ঝলসে গেলো।

বেগমসাহেবা গান শুনে ফিরছিলেন। একখানি সাধারণ শাড়ি পরনে। হু'হাতে হুটো ফুলের বালা। খোঁপায় জড়ানো একটি বেলফুলের মালা। কপালে ছোট্ট একটি তিলকের টিপ। ডাগর ডাগর হু'টি চোখে কাজলের রেখা।

বাদশা ডাকলেন: 'শোন!'

চকিত চরণ থেমে গেলো। চমকে উঠলেন বেগমসাহেবা। চোখ তুলে দেখলেন, বাদশা দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে ডাকছেন।

ধীরে ধীরে কাছে গেলেন বেগমসাহেবা। মাথা নত ক'রেই বললেন, 'আমায় ডাকছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'রোজ রোজ কোথায় যাওয়া হয়?' বাদশার কণ্ঠে একটু রাগের ঝাঁজ।

আবার চোখ তুললেন বেগমসাহেবা। জ্বলজ্বল করা কালো হু'টি চোখের তারায় একটা কি আবেদন যেন করুণ হয়ে এলো। বললেন, 'আপনি তো সব জানেন জাহাঁপনা।'

'হ্যাঁ, জানি। কিন্তু কতোকাল এ চলবে?'

'যদ্দিন জীবন আছে।'

'ফিরবে না?'

'না, ফিরতে পারবো না। কবির গানে, আমি নিজের মনের কথা খুঁজে পেয়েছি জাহাঁপনা। কবিকে আমি ভালোবাসি।' কথাটা

সোজাসুজি বলতে গিয়ে থরথর ক'রে কেঁপে উঠলেন বেগমসাহেবা। কেঁপে উঠলেন বাদশাও। দু'হাতে তিনি ঠেলে দিলেন বেগমকে। ফেলে দিলেন। বেগমের হাতের বালা খসে পড়লো। খোঁপার মালা ছিঁড়ে গেলো। দু'হাতে তিনি বাদশার পা দু'টি জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। বেগমসাহেবার বুকে একবার পদাঘাত ক'রে বাদশা তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

•

পরদিন বেঁধে আনা হলো চণ্ডীদাসকে। সঙ্গে আনা হলো রামীকে। আর আর প্রিয়-পরিজনকে। গৌড়েশ্বরের হুকুম: চণ্ডীদাসের আপনজনের চোখের সামনেই চাবকে তাঁকে হত্যা করতে হবে।

অনুচরেরা আজ্ঞা পালন করলে।

হাতীর পিঠে কষে বাঁধা হলো চণ্ডীদাসকে। সামনে—পাগলিনী দু'টি নারী-মূর্তি। রামী আর বেগমসাহেবা। রামী কেঁদে বললে, 'ঠাকুর, বাশুলী তোমায় শুধু আমাকে ভালোবাসতে বলেছিলেন, কেন তুমি তাঁর কথা শুনলে না ঠাকুর? কেন তুমি তাঁর কথা শুনলে না?'

পাথরের মতো নিশ্চল দু'টি চোখ মেলে চণ্ডীদাস শুধু তাকিয়ে রইলেন অশ্রুমুখী রামীর দিকে। সে-চোখ শান্ত। একটু বেদনা নেই।

গৌড়েশ্বর কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন। হুকুম করছিলেন। বেগমসাহেবা ছুটে গিয়ে তাঁর পায়ে পড়লেন। বললেন, 'জাহাঁপনা, কবির দোষ নেই। কবির কোন দোষ নেই। দোষী আমি। এই হতভাগিনী। আপনি আমার প্রাণ নিন জাহাঁপনা, কবিকে ছেড়ে দিন।'

এক ঝামটায় বেগমকে ঠেলে দিলেন বাদশা।

একগুচ্ছ ফুলের মতো তাঁর নরম দেহ রুক্ষ-শুষ্ক মাটিতে ছড়িয়ে পড়লো। গড়িয়ে পড়লো। বেগমসাহেবা জ্ঞান হারালেন।

বাদশা হুকুম দিলেন, 'কোড়া চালাও, কোড়া চালাও।'

কোড়া চললো। ক্ষত-বিক্ষত হলেন চণ্ডীদাস। রক্ত ছুটলো ঝলকে ঝলকে।

চণ্ডীদাসের মুখে শব্দ নেই। যেন তাঁর জ্বালা নেই। চোখের পাতা ছু'টিকে টেনে টেনে একবার রামীর মুখের দিকে চাইলেন চণ্ডীদাস। তারপর হঠাৎ একসময় তাঁর দৃষ্টির আলো নিবে গেলো।

রামী মাটিতে গড়িয়ে পড়লো। বাদশাকে বললে, 'জাহাঁপনা, আপনার জীবনে ধিক্, আপনি প্রেম কি তা বুঝলেন না।' প্রেমের মর্যাদা দিলেন না।'

বাদশার উচ্চহাস্যে রামীর কণ্ঠ তলিয়ে গেলো। বাদশা চলে গেলেন।

এবারে মাটি থেকে উঠলো রামী। একবার বেগমসাহেবার কাছে গেলো। একগুচ্ছ ঝরা ফুলের মতো পড়ে রয়েছেন বেগম-সাহেবা। সাড়া নেই। শব্দ নেই। বুকে হাত দিয়ে দেখলে, প্রাণও নেই। চণ্ডীদাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রাণও কখন উড়ে গেছে। আজ কেন যেন বেগমসাহেবার পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে রামী। তাঁর বুকে ছু'ফোটা চোখের জলও ফেললে। তারপর একসময় সামনের পথ ধরে রওনা হলো সে। আর পিছন ফিরে চাইলে না।

কতো দিনের কথা। কতো কালের কাহিনী, কিন্তু আজও মনে হলে চোখে জল আসে। রামীর সে সুরের কান্না মনে যেন ঝড় তোলে ঃ

'আম্মা মুখ চাঞা গজপিষ্টে সুঞ্যা
রয়্যাছ বদন পাকে।
রাজা গৌড়েশ্বর ছুষ্ট কলেবর
কেহ না বুঝাল তাকে।'

এ চিত্র কি ভোলা যায়?

একটি কঙ্কালের কাহিনী



দেমাকে যেন মাটিতে পা পড়ে না—ফয়জানের। দেশের নবাব- বাদশা, উজির-আমির তার কাছে বাঁধা। তার উনিশ বছরের যৌবন উত্তাল হয়ে গ্রাস করেছে সবাইকে। রাজ-রাজড়ার চোখের কাচে তার উনিশ বছরের রূপ ঝলসিত। কেউ বলেঃ 'মেরাজান।' কেউ বলে, ফয়জান বিবি। দু'চোখ থেকে ধারালো কটাক্ষের ফলা ছুঁড়ে ফয়জান খিলখিল ক'রে হাসে। হাসির ঢেউ-এ আরও অপরূপ হয়ে ওঠে সে। চুলে গোঁজা ফুলগুলো টেনে টেনে ছিঁড়ে ছিঁড়ে এ-দিক্ ও-দিক্ ছড়িয়ে দেয়। রক্তলাল ঘাগরাটা ফুলিয়ে ফুলিয়ে একসময় তারা-বোনা কার্পেটের উপর ঝুপ ক'রে বসে পড়ে। সারা দেহে তার একটা চকিত হিল্লোল খেলে যায়। অনুরাগীরা 'আহা' 'আহা' করে।

রাজপথের প্রশস্তি আরও উদ্দাম। গুলাব জলে স্নান সেরে প্রতি সন্ধ্যায় পথে বেরোয় ফয়জান। তার দু'ঘোড়ার জুড়িগাড়ি ঝমঝম ক'রে চলে। লোকে জানে কে আসে। গাড়ির শব্দেই বোঝে। সারা দিল্লীতে অমন গাড়ি আর কারো নেই। নেই অমন ঘোড়া। সেই গাড়ির ঝমঝম শব্দ শুনলেই দিল্লীর পথ চঞ্চল হয়ে ওঠে।

'আ গেয়ি। জানবিবি আ গেয়ি।'

একটা হাল্লা, একটা উচ্ছ্বাস দিল্লীর প্রাসাদাবলীর কার্নিসে কার্নিসে বাড়ি খেয়ে দূরে দূরে গড়ায়। অনেক অনেক লোকের শৃঙ্খল বড় রাস্তায় এসে ভেঙে পড়ে। ছেঁড়া ছেঁড়া ভিড় মোড়ের মাথায় মাথায় জমে ওঠে।

গাড়ি আসে। খোলা গাড়ি। বড় সুন্দর হয়ে সাজে ফয়জান। আসমানী রঙের শালোয়ার পরনে। মাথায় ওড়ানো ফিনফিনে গোলাপী উড়নি। সেই উড়নির আড়ালে ফয়জানের সোনা-মাজা মুখ সন্ধ্যার অন্ধকারেও ঝিলিক দেয়। সুর্মাটানা বড় বড় দু'টি চোখ জ্বলে ওঠে। এ-দিক্ ও-দিক্ তাকায়। অনেক অনেক দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়ে তার মুখে—বুকে। অনেক দৃষ্টির ফলা ঠেলে এগুতে হয় ফয়জানকে। কিন্তু ফয়জানের তাতেই আনন্দ। কেমন যেন নেশা আছে এমনি দৃষ্টিতে আক্রান্ত হওয়ার মধ্যে। কেমন কেমন একটা পুলক। ফয়জানের সারা গা সিরসির করে তাতে। বুকের কাছাকাছি রক্ত করে উথাল-পাথাল। তার উনিশ বছরের টুপটুপে যৌবন শিরায় শিরায় প্রমত্ত হয়ে ওঠে।

ফয়জানের এই রূপলাবণ্যের কথা সিরাজ একদিন শুনলেন। শুনলেন আর মজলেন। ফয়জানের উনিশ বছরের যৌবনে ডুবলেন সিরাজদ্দৌলা। লাখ রুপেয়া ইনাম দিয়ে ফয়জানকে তিনি মুর্শিদাবাদে নিয়ে এলেন।

ফুলে সাজানো ঝালর দুলানো পাল্কী থেকে নেমে এলো ফয়জান। ছিমছিমে গড়ন। টানা টানা চোখ। টিকলো নাক। ডোরাকাটা সাপের মতো কাঁধের দু'পাশে গড়ানো ছিলকা জড়ানো দু'টি বেণী।

তরুণ সিরাজ দাঁড়িয়েছিলেন। সেই প্রথম দেখলেন তিনি ফয়জানকে। দেখে মুগ্ধ হলেন।

সারা দেহে সিরাজ কেমন যেন একটা শিহরন অনুভব করলেন। কি একটা বিদ্যুৎ-জ্বালা পায়ের তলা থেকে সিরসির ক'রে উপরে উঠে মাথায় যেন তাঁর টোকা দিয়ে গেলো। ফয়জানের চোখ থেকে চোখ ফেরাতে পারলেন না সিরাজদ্দৌলা। ফয়জানের 'হারেমে' ঠাঁই হলো।

দিন কাটে। মাস যায়। ফয়জানকে নিয়ে জীবনের নতুন মানে

খুজে পান সিরাজ। ফয়জানের কাছে নিজেকে একেবারে ঢেলে দেন। বাইরের কোন মোহই আর টানতে পারে না সিরাজকে। কোন লোভই আর তাঁকে লুব্ধ করে না। তাঁর মনের কোণে আজ একটি মুখই শুধু স্বপ্ন নিয়ে জ্বলে। সে-মুখ রূপবতী ফয়জানের।

কোন কোন দিন রাতে চাঁদ ওঠে। ফুলবাগে ফুল ফোটে। ভাগীরথীর জলে রূপোর আলপনা। বকুলতলায় আলোছায়ার লুকোচুরি। সেদিন আর ঘুম নামে না চোখে। সারা রাত জেগে কাটান সিরাজ। তাঁর চোখের উপর দিয়ে কতো স্বপ্ন উড়ে যায়।

ফয়জান গান গায়। মুগ্ধ বিস্ময়ে সিরাজ চেয়ে থাকেন। সুরের রোশনাই-এ ফয়জানকে আরও যেন সুন্দরী বলে মনে হয়। রাত কেটে যায়।

কিন্তু ফয়জান?

ফয়জানের মন যেন উড়ু উড়ু। উড়ু উড়ু চড়াই পাখি। সিরাজের প্রতি আকর্ষণ নেই তার। আর মোহ নেই। তার চোখে বিশ্রী রকমে ফুরিয়ে গেছেন সিরাজ।

একদিন সৈয়দ মহম্মদ খাঁর সঙ্গে পরিচয় হলো ফয়জানের।

সৈয়দ মহম্মদ সিরাজের ভগ্নীপতি। সুন্দর, বলিষ্ঠ পুরুষ। তার চোখে কি যেন দেখেছে ফয়জান। হয়তো দিল্লীর স্তাবকদের দৃষ্টি। হয়তো পথচারীদের প্রত্যাশা। হয়তো তার প্রস্ফুটিত যৌবনের ছায়া। তাই তাকে ভালো লেগেছে ফয়জানের। তাকে সে ভালোবেসেছে। অনেক দিন পরে আবার যেন জেগে উঠেছে ফয়জান। দিল্লীর বাঈজী ফয়জান। আয়নায় আবার সে নিজেকে দেখে, নিজের মনকে দেখে। আর দেখে সৈয়দ মহম্মদ খাঁর মুখ, তার ছু'টি কামনা-রাঙা চোখ। হেসে হেসে সে কুটি কুটি হয়। বিছানায় গড়িয়ে পড়ে। সৈয়দ মহম্মদের প্রত্যাশা করে। তার উথাল-পাথাল রক্তে ঝড়। ছু'টি ঠোঁটে নরম উষ্ণতা।

কথাটা একদিন সিরাজেরও কানে গেলো। সত্যি তিনি ভালোবেসেছিলেন ফয়জানকে। ফয়জানের মধ্যে মনের শান্তি খুঁজেছিলেন। কিন্তু তা হলো না। ফয়জান বিশ্বাস রাখলে না। দূরে সরে গেলো। তাই কথাটা শুনে প্রথমে ভেঙে পড়েছিলেন সিরাজ, কয়েক ফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়েছিল তাঁর চোখ থেকে। কিন্তু ধীরে ধীরে রঙ বদল হলো সে-চোখের। সে-চোখ লাল হলো। কি একটা প্রতিজ্ঞায় যেন জ্বলে উঠলো।

'বেইমান! বেইমান!' বলে লাফিয়ে উঠলেন সিরাজ। ছুটলেন হারেমের দিকে।

হারেমের এক ঘরে প্রসাধন করছিল ফয়জান। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সুর্মা টানছিল চোখে। সিরাজ এলেন। রাগে কাঁপছেন। বললেন, 'এতোদিনে জানলেম, সত্যি তুমি কুলটা।'

তাঁর কথায় একবার যেন শিউরে উঠলেন ফয়জান। সুর্মার পালকটি হাত থেকে খসে পড়লো।

কিন্তু না। ভয় পায় নি সে। একটু কি ভেবেই যেন খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো। বললে, 'জাহাঁপনা তো প্রথম থেকেই তা জানেন। লাখ রুপেয়ায় আমায় কিনে এনেছেন। এ কথা আমায় না বলে বরং আপনার মাকে—'

কথা শেষ করলে না ফয়জান। একটু হাসলো। হাসির ভেতর দিয়েই একটা ব্যঙ্গের ছুরি ছুঁড়ে দিলে। চমকে উঠলেন সিরাজ। লাফিয়ে উঠলেন একবারে। বললেন, 'মা? আম্মা?'

আবার খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো ফয়জান। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের ধারালো দু'টি কালো তারাও যেন নেচে উঠলো।

বললে, 'কেন? জাহাঁপনা কি হোসেনকুলীর নাম ভুলে গেলেন। হোসেনকুলীর সঙ্গে আপনার মায়ের—আমিনা বেগমের মহব্বত—'

'হোসেনকুলী!' একটা আগুনের হলকা এসে যেন সিরাজের

গায়ে লাগলো। একটা বিষাক্ত স্মৃতি যেন তার মনকে আহত করলো। রাগে থরথর ক'রে আবার কেঁপে উঠলেন সিরাজ। তলোয়ারের সন্ধানে কোমরে হাত দিলেন। না, তলোয়ার নেই। সিরাজ নিরস্ত্র। দু'হাত বাড়িয়ে ফয়জানের সরু গলাটা চেপে ধরতে গিয়েও আবার হাত নামিয়ে নিলেন তিনি। বুঝলেন : না, না। ওভাবে নয়, এ পথে নয়। বিশ্বাসঘাতিনীর শাস্তি আরও ভীষণ। আরও ভয়াবহ। বলতে বলতে একবার থামলেন সিরাজ। একটু ভাবলেন। তারপর হঠাৎ ঘরের বাইরে এসে—দ্বারের বাইরে এসে দরজায় শিকল টেনে দিলেন। লোকজনদের ডেকে বললেন : 'দেয়াল দিয়ে ঘরের দরজা গেঁথে দাও। যে রূপের দেমাকে ও আমায় উপেক্ষা করে, সেই রূপ নিয়ে বদ্ধ ঘরে ও তিল তিল ক'রে শুকিয়ে মরুক।' লোকজনেরা হুকুম পালন করলে।

বদ্ধ ঘর। আলো নেই। হাওয়া নেই। একটা বীভৎস অন্ধকার শুধু থমথম করছে।

প্রথমটায় সেই অন্ধকার ঘরের এপাশ ওপাশ উন্মাদ হয়ে ছুটলে ফয়জান। সিরাজকে গালাগাল দিলে। অভিশাপ দিলে। কিন্তু তারপরই একসময় থমকে দাঁড়ালো হঠাৎ। শ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে। ঘামে নেমে উঠেছে সারা দেহ। গায়ের জামাটা লেপটে গেছে বুকের সঙ্গে। হৃদ্‌স্পন্দন অনুভব করবার জন্যে তার ভয় থরথর হাতখানা একবার বুকে রাখলে ফয়জান। বুকে হাত পড়তেই মনটা তার কেমন যেন চন্‌ ক'রে উঠলো। রক্তে চাঞ্চল্য জাগালো। তার ক্ষুদিত যৌবন ডুকরে কেঁদে উঠলো। সুর্মা টানা চোখের কোণ বেয়ে জলের ঢল নামলো। এবারে চাতালে লুটিয়ে পড়লো সে। রূপবতী ফয়জান জীবনে এই প্রথম হয়তো কেঁদে বললে, 'জাহাঁপনা, আমার গর্ব গেছে ; মোহ গেছে। আমার ভুল আমি বুঝেছি। আপনার পায়ে পড়ি জাহাঁপনা, আমাকে

বাঁচতে দিন। আমাকে বাঁচান।' কিন্তু বদ্ধ ঘরের এ কান্না বাইরের হাওয়ায় মিলতে পারলো না। তাতে থমথমে অন্ধকার ঘর একবার শুধু ঝমঝম ক'রে উঠলো।

তিন মাস পরে দেয়াল ভাঙা হলো। ঘর খোলা হলো। আলো ঢুকলো সে ঘরে। সেই আলোতে দেখা গেলো রূপবতী ফয়জানের রূপের পরিণাম; গলিত, বিবর্ণ মাংসস্তূপের মাঝে একখানি দীর্ঘ কঙ্কাল।

সূর্য মাঝির ঘাট



ইতিহাসে তার নাম নেই। লেখা-জোখা নেই কোথাও। তবুও পথ চলতে পথের লোককে জিজ্ঞেস করলে সে বলে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। চিনি, খু-উ-ব চিনি। যশোর জেলায় বাড়ি, সূর্য মাঝির ঘাট চেনবো না। এই তো দু'খেন জমিন পাড়িয়ে যান, সামনে সোজা সড়ক। সেই সড়ক গিয়েই তো লেইগেছে সূর্য মাঝির ঘাটে। হ্যাঁ, বেটা মরদ ছেলো বটে, এক রাতেই সাগর পার!'

'কিন্তু—'

'অঃ, বুঝিচি, বই-পত্তরে নাম নেই। তা থাকব কি রকম। নাম কি আর ঠিক থাকে? দিন দিন যে তা বদল হয়। আজ এই, কাল আর। তাই সূর্য মাঝির ঘাট আজ মহেশপুর।'

'মহেশপুর!'

'হয়, বাপ-ঠাকুর্দা ক'তো মহেশ,—মাঝির বেটার নাম। সেই মহেশ থেকেই তো মহেশপুর।'

যশোর জেলার ছোট্ট গ্রাম মহেশপুর আগের দিনের সূর্যদ্বীপ। কিন্তু জেলার মানচিত্রে আজ আর সূর্যদ্বীপের নাম নেই। মানচিত্রে ছোট্ট একটি কালির ফোঁটার দিকে আঙুল উঁচিয়ে লোকে দেখায় মহেশপুর। সূর্যদ্বীপের নতুন নাম মহেশপুর। কিন্তু নাম পাল্টালেই মানুষের মন পাল্টায় না। বাইরে যা মুছে গেলো, মন থেকে তো তা মোছে না। মানুষের মনে—অনেক কথা-কাহিনীতে জড়িয়ে থাকে বাইরে মুছে যাওয়া সেই নামের চুমকি। চুমকির মতোই তা ঝিকমিক করে। মহেশপুরের ভেঙে-পড়া একটি বাড়ির দিকে দৃষ্টি রেখে লোকে আজও তাই বলেঃ ঐ—ঐ সে সূর্য মাঝির কোঠাবাড়ি। ঐ তো সূর্য মাঝির ঘাট।

বাংলার সেন বংশের তখন জয়জয়কার। বঙ্গ-রাঢ়-বারেন্দ্র ও বাগড়ী জুড়ে তখন সেনরাজ্য। সেনরাজা বল্লাল সেন।

বল্লালের তখন বয়েস হয়েছে। ছেলেপুলেরা বড় হয়েছে। রাজপুরীতে আনন্দের ঢল। চারদিকে রাজার নাম-ডাক।

সেই বয়সেই একদিন শিকারে বেরোলেন বল্লাল সেন। লোকজনও সব সঙ্গে ছিল। কিন্তু তারা পেছনে পড়ে রইলো। শিকারের সন্ধানে এ-বন সে-বন ক'রে একসময় সবুজ অরণ্যের গভীরতায় হারিয়ে গেলেন তিনি।

ওদিকে সূর্য গড়িয়ে পড়লো পশ্চিমে। অপরাহ্নের স্নিগ্ধতা নামলো বনভূমিতে। উত্তরের আকাশে উঠলো একখণ্ড মেঘ। কৃষ্ণ-কজ্জল মেঘ। একটা পাহাড়ের মতো। সেই মেঘ বড় হলো। একটা দানবের মতো ভীষণ আক্রোশে ছড়িয়ে পড়লো আকাশময়। গাছের পাতারা নড়ে উঠলো। ডালগুলো সব কেঁপে উঠলো। বাতাসে জাগলো আর্তনাদ। ঝড় এলো।

বল্লাল সেন প্রথমটায় ছুটলেন। কিন্তু পথ কোথায়? দিগন্ত-বিসারী অরণ্য ঝড়ের উন্মত্ততায় দাপাদাপি করছে। কোথাও মড়-মড় ক'রে ভেঙে পড়েছে শাখাবাহু। বল্লাল সেন একবার থামলেন। একবার আকাশের দিকে চাইলেন। কালো মেঘে মুড়ে গেছে আকাশ। মাঝে মাঝে চিড়বিড় ক'রে তার বুক ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছে বিদ্যুৎ-জ্বালা। অরণ্যানির মাথায় মাথায় ভীরু বেতসের কম্পন।

বল্লাল আবার এগুলেন।

এবার আকাশ গুড়গুড় ক'রে ডেকে উঠলো। কোথায় কোন্ রূপকথার দেশে পাষাণপুরী বুঝি ভেঙে পড়লো। সারা অরণ্য জুড়ে তার স্খলনের আর্তনাদ। আর তার সঙ্গে সঙ্গে শত মানুষের অবিরল কান্নার মতো বৃষ্টি।

বল্লাল আবার ছুটলেন। ঝড়ে উড়ে, জলে ভিজে ছুটলেন। দূরে—অনেক দূরে, যেন কম্পিত একটি আলোর শিখা দেখা গেলো। বুঝিবা লোকালয়। বল্লাল সেই পথেই পা বাড়ালেন।

লোকালয়? হ্যাঁ, লোকালয়। ডোমপল্লী। বল্লাল ডোমপাড়ারই একটি দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

'কে?'

ভেতর থেকে প্রশ্ন এলো। যুবতী কণ্ঠ। মিষ্টি।

বল্লাল বললেন, 'আমি গো, আমি। আমি পথিক। বাইরে ঝড়-জল। একটু আশ্রয় দেবে? আমি আশ্রয় চাই।'

খুলে গেলো দরজা। একটি কম্পিত দীপশিখাকে হাতের আড়াল ক'রে দাঁড়িয়েছে এক কুমারী কন্যা। যুবতী। বিস্ময়ভরা তার ডাগর ডাগর দু'টি চোখ।

বললে, 'মহারাজ, আপনি?'

মুগ্ধ বল্লালের সতৃষ্ণ দু'টি দৃষ্টি গড়িয়ে চলেছে কুমারীর সারা দেহে। অপূর্ব এ রূপ ডোমকন্যার। যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। একটি

জীর্ণ শাড়ির আড়ালে গোপন-করা যেন অন্তহীন রূপের উৎস। বল্লালের মুখে কথা নেই। বাইরের পৃথিবীর অস্তিত্বের কথাই যেন ভুলে গেছেন বল্লাল সেন। ঝড়-জল সব মিছে। মনের মুকুরে সত্য হয়ে রয়েছে একটি রূপ—একটি কন্যা। আর সব মিথ্যে। মিথ্যে।

ডোমকন্যা ডাকলেঃ 'বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে আসুন মহারাজ!'

'ও, হ্যাঁ। যাচ্ছি। যাই।'

ধ্যান ভাঙলো যেন বল্লাল সেনের। ডোমকন্যার আহ্বান যেন শত সংগীতের মতো বাজলো তাঁর কানের কাছে।

বল্লাল সেন ভেতরে গেলেন।

ডোমকন্যা মহারাজের পরিচর্যার ত্রুটি করলে না।

অতি শুভ্র দধি বাঁশের বেতিতে লৈলা।
পরম যতন করি রাজভোগ দিলা॥
তাহাতে সন্তুষ্ট রাজা হইলা বহুতর।
দিলা রাজা ধন, রত্ন, বস্ত্র, অলঙ্কার॥
বিবাহ করিব বলি লৈয়া আইলা ঘরে।
যেবা শুনে, যেবা জানে শত নিন্দা করে॥

(যদুনন্দনের ঢাকুর)

ডোমকন্যাকে সত্যি বিয়ে করবার সঙ্কল্প করলেন বল্লাল সেন। যে নিন্দে করবে, তাকে রাজ্যছাড়া করবেন। ভিটে-মাটি কেড়ে নেবেন তার। রাজপুরীতে নয় শুধু, রাজ্যময় একটা হাহাকার উঠলো। একটা বেদনার প্রবাহ গড়িয়ে চললো।

একদিন লক্ষ্মণ সেন এলেন বাবার কাছে। বললেন, 'রাজ্যে যে আর কান পাতা যায় না বাবা।'

'কেন, হয়েছে কি?'

'ওরা সব বলছে—'

'আমি বিয়ে করছি?'

একটু হাসলেন বল্লাল সেন। আবার বললেন, 'তাতে হয়েছে কি? লোকে নিন্দে করে? তা লোকনিন্দেয় কি এসে যায়?'

'সুধার আকর চন্দ্র বিধির বিধান।
নিষ্কলঙ্ক সে যে নহে কলঙ্কে প্রমাণ॥
কলঙ্কে কি করে সুত! গুণ আছে যার।
চন্দ্র সে অত্রির পুত্র অজ্ঞাত কাহার?'

পিতার কথায় সন্তুষ্ট হলেন না লক্ষ্মণ সেন। আবার বললেন। অনেক ক'রে বোঝালেন। বললেন, পুরবাসীদের কথা, প্রজাবৃন্দের কথা। কিন্তু তাতে যেন জ্বলে উঠলেন বল্লাল সেন। সিংহাসন থেকে লাফিয়ে উঠলেন। দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ ক'রে বললেন, 'ও সব পুরবাসীদের কথা নয়, কারো কথা নয়। ও হলো তোমার কথা। তোমার হিংসের কথা। স্বার্থের কথা। এ সেন বংশে আর কোন আগন্তুক এসে যাতে ক'রে ভাগীদার হয়ে না দাঁড়ায়, তোমার লক্ষ্য শুধু সেদিকে। বেশ, আমার কাজ যদি তোমার পছন্দ না হয়, তাহলে আমার চোখের সমুখ থেকে তুমিও সরে যাও। তোমাকে আমি নির্বাসন দিলাম। তোমার মুখ আমি দেখতে চাইনে।'

বলতে বলতে থরথর ক'রে কেঁপে উঠলেন বল্লাল সেন।

লক্ষ্মণ সেন যেন থমকে দাঁড়িয়ে রইলেন। পা নড়লো না, কথা সরলো না তাঁর মুখ থেকে। চোখ থেকে গড়িয়ে পড়লো শুধু কয়েক ফোঁটা উষ্ণ চোখের জল। তার পর প্রাসাদে এসে সেই দিনই বাগড়ী ছেড়ে রামপাল রওনা হলেন। স্ত্রী এসে পথরোধ ক'রে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু না, কেউ পারলে না তাঁকে সংকল্প থেকে সরিয়ে নিতে। বাগড়ীর আলো-হাওয়া তাঁর কাছে যেন বিষের মতো মনে হলো।

দিন যায়, মাস যায়। মাসে মাসে বছর। আকাশে আবার

নতুন মেঘের খেয়া শুরু হলো। সেই শ্যামল-কজ্জল মেঘ পুঞ্জে পুঞ্জে ছুটে এলো মহাসাগরের উন্মত্ত আবেগ নিয়ে। দাদুরীরা আবার মত্ত হলো। ডাহুকীরা আবার ডেকে উঠলো। 'হরি বিনে দিন রাতিয়া' যাদের কাটাতে হয়, ঘরে ঘরে তাদের সতৃষ্ণ প্রার্থনা যেন নব আষাঢ়ের মেঘের মতোই ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো। বল্লালপুরীর অজস্র প্রাচুর্যের মাঝেও একটি প্রাণের কান্না ফুটলো—যৌবন রসোচ্ছল থরথর কম্পিত সতৃষ্ণ একটি প্রাণ।

সেদিন অন্দরে গেছেন বল্লাল সেন। মধ্যাহ্ন-ভোজনে। ভোজনশালায় পা দিতেই তাঁর চোখে পড়লো, সলজ্জ, ভীরু পদক্ষেপে বৌমা (লক্ষ্মণ সেনের স্ত্রী) অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ যেন কি সন্দেহ হলো বল্লাল সেনের। এগিয়ে গেলেন তিনি পেছনের দরজার দিকে। কিন্তু দেয়ালের গায়ে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়ালেন বল্লাল সেন। আর তাঁর পা চললো না। দেয়ালের গায়ে লেখা রয়েছে একটি শ্লোক—একটি শোক—একটি কামনা—একটি প্রার্থনা ঃ

'পতত্যবিরলং বারি
নৃত্যন্তি শিখিনো মুদা।
অদ্য কান্তঃ কৃতান্তো বা
দুঃখস্যান্তং করিষ্যতি ॥'

অবিরল ধারায় বারিপাত হচ্ছে, শিখিরা সুখে নৃত্য করছে। এমনি দিনে আমার প্রিয় অথবা মৃত্যুই আমার দুঃখ দূর করবে।

বল্লাল সেন শ্লোকটি পড়লেন। বুঝলেন।

মধ্যাহ্ন-ভোজন তাঁর হলো না। বাইরে বেরিয়ে এলেন। সোজা চলে গেলেন রাজদরবারে।

দরবারে রাজনাবিকদের ডাক পড়লো।

বল্লাল সেন বললেন, 'কাল সূর্যোদয়ের আগে লক্ষ্মণকে এখানে নিয়ে আসতে হবে। তোমাদের ভেতর কে আছো তেমন বাহাদুর নাবিক, এগিয়ে এসো। যদি এ কাজে সফল হও, পুরস্কার পাবে আমার রাজ্যের একটি অংশ। এসো। এগিয়ে এসো।'

কেউ আসে না। কেউ ওঠে না। দরবার ঘরে গড়িয়ে যায় ভ্রমর গুঞ্জনের মতো ছেদহীন একটা ফিসফিস শব্দ। বল্লাল সেন আবার বলেন, 'এসো, এদিকে এগিয়ে এসো।'

এবারে সত্যি উঠে এলো একটি মানুষ। মাঝামাঝি বয়স। কপাটের মতো চওড়া বুকের পাটা, শাবলের মতো দৃঢ় দু'খানি বাহু।

'সূর্য মাঝি, সূর্য মাঝি।' একটা চাপা কলরব উঠলো দরবার গৃহে। লক্ষ্মণের কাছে একখানি চিঠি লিখলেন বল্লাল সেন। লিখলেন ঃ

'সন্তপ্তা দশমধ্বজাগতিনা
সন্তাপিতা নির্জনে।
তুর্য্যদ্বাদশবৎ দ্বিতীয়ম
তিমন্নেকাদশেভস্তনী॥
সা ষষ্ঠী নৃপপঞ্চমস্থ
ভবিতা ভ্রূসপ্তমী বর্জিতা।
প্রাপ্নোত্যষ্টম বেদনাং
প্রথম হে তূর্ণং তৃতীয়ো ভব॥'

হে বৃষ (২য়) বৎ বলী (পুত্র), মকর (১০ম) সমাগমে কর্কট ও মীনবৎ (৪র্থ ও ১২শ), মকরকেতন (কন্দর্প) সমাগমে করি কুম্ভ (১১শ) স্তনী (বধূ) প্রপীড়িতা এবং সেই তুলা (৯ম) বা তুলনা রহিত অর্থাৎ অতুলনীয় ভ্রূসম্পন্না কন্যা (৬ষ্ঠ) সিংহ (৫ম) তুল্য রাজকুমারের পত্নী হ'য়েও বৃশ্চিক (৮ম) বৎ যন্ত্রণাভোগ করছে, হে মেষবৎ (১ম, বিনীত পুত্র) শীঘ্র এসে উভয়ে মিথুন (৩য়) অর্থাৎ মিলিত হও।

চিঠি নিয়ে মাঝি ছুটলো রামপালের পথে। চোখের নিমিষে তার শত-মাল্লার নাও দিগন্তের কোলে মিশে গেলো।

সারারাত আর ঘুমোতে পারলেন না বল্লাল সেন। সারারাত তিনি শুধু ঘর-বার করলেন। নিজের উপর ঘৃণা হলো। লক্ষ্মণকে নির্বাসন দেওয়ার জন্যে অনুশোচনা হলো। অন্ধকারে বুঝি গড়িয়ে পড়লো কয়েক ফোঁটা চোখের উষ্ণ জলও।

শেষ-রাতে পাইক এসে খবর দিলেঃ 'মহারাজ, এসেছে, এসেছে। মাঝির নায়ের মাস্তুল দেখা গেছে।'

আজ নিজেই নদীর ঘাটে গেলেন বল্লাল সেন। সত্যি নাও এসে ঘাটে লাগলো। নাও থেকে বেরিয়ে এলেন লক্ষ্মণ সেন। সূর্য মাঝি বল্লালের পদধূলি নিলে।

বল্লাল সেন তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলে আজ। বললেন, 'মাঝি, তুমি আমার মুখ রেখেছো। তোমায় আমি কি দেবো? তোমায় দিলাম একটি দেশ। একটি গ্রাম। তোমার নামে নাম হোক সেই গাঁয়ের। সূর্যদ্বীপ। সূর্যকরে দীপ্ত।

সূর্য মাঝি মাথা নীচু ক'রে রইলো।

এই সেই সূর্যদ্বীপ। সূর্য মাঝির ঘাট। সূর্য মাঝির হিম্মতভরা দেশ। লোকস্মৃতি—লোককথায় আজও সে জীবন্ত। পথ চলতে পথের মানুষকে জিজ্ঞেস করলেও সে বলে দেয়, 'যান। যান। এই তো কেবল সামনের দু'খেন চক, তার পরই সূর্য মাঝির বাড়ি, সূর্য মাঝির ঘাট। তারে চেনবো না? তারে ভুলবার জো আছে? ভুলতে পারে কেউ?' '

পোড়া রাজার অগ্নিকুণ্ড



অগ্নিকুণ্ডে আগুন নেই।

না, আগুনের শিখাটুকুও নেই। কলমিলতার থকথকে বাহুর তলায় থির হয়ে পড়ে থাকে অগ্নিকুণ্ডের কাজল কালো জল। একটু নড়ে না। একটু কাঁপে না। যেন কলঙ্কের বিষ খেয়ে সে মরে আছে। পড়ে আছে। যুগ যুগ ধরে। মাথার উপর সজনে ডালের ছায়া। চিকন চিকন সবুজ পাতায় কতো তার জিজ্ঞাসা। কতো তার আকূতি।

কেন? কেন? পড়ে আছো কেন? বর্ষা এলো। ধলেশ্বরীর ঢল নেমেছে। খালে-বিলে যৌবন। জাগো। ওঠো তুমি। তোমার দুঃখ কিসের?

না। তবু জাগে না। তবু বাড়ে না।

ধলেশ্বরীর দুধেল জল, মেঘনার মেঘেল জল ফুলে ওঠে। খাল-বিল, ডাঙা-ঝিল তার ছোঁয়ায় দুলে ওঠে। শুধু অগ্নিকুণ্ড নির্বাক। ভাষা নেই। কথা নেই। হিম। হিমশীতল। সজনে ডালের উপর দিয়ে সূর্যও তাকে এড়িয়ে এড়িয়ে যায়।

অগ্নিকুণ্ড। কলঙ্কের কালীদহ। কে চাইবে তার দিকে?

কিন্তু চায়। ও পাশের ও মেঠো পথ দিয়ে যেতে যেতে পথচারীরা চায়। কেউ কেউ বা বলে: ঐ, ঐ সে অগ্নিকুণ্ড।

সকাল বেলায় বাসন মাজতে বসে বৌ-ঝি'রাও বলাবলি করে। বলে বহু—বহু দিন আগেকার এক অশ্রু-সজল কাহিনী। বল্‌তে বলতে কারো কারো চোখের পাতা ভিজে ওঠে। অগ্নিকুণ্ডের অশ্রুঝরা

কাহিনী তাদের বুকেও বুঝি জ্বালা ধরিয়ে দেয়। তুরন্ত এক ঝলক বাতাসের মতো এক-একটি দীর্ঘশ্বাসও বুঝি বেরিয়ে আসে।

বিক্রমপুরের সিংহাসনে তখন দ্বিতীয় বল্লাল সেন। জ্ঞানে-গুণে, দয়া-মায়ায় রাজার যেন তুলনা নেই। প্রজার তুঃখ ? রাজা ছুটলেন। কি তুঃখ ? কেন সে তুঃখ ? রাজা শুনলেন তা। সাধ্যমতো তা দূর করবারও চেষ্টা করলেন। প্রজার মন কেড়ে নিলেন।

প্রজারা বলে : 'রামপালে আইজ রামরাজা। আমাগো বল্লাল রাজা পরম দয়াল। বাপ-মায়ের পুণ্যি যে এমন রাজার রাজ্যে আছি।'

'হয়, হয়, হয়।' এক জায়গায় নয়, দশ গ্রামে তার সমর্থন। দশ গ্রামেরও সীমা ছেড়ে দূরে দূরে উড়ে যায় কথাটা। অন্য রাজ্যের লোকও গুণ গায় বল্লালের।

সেই বল্লাল—সেই বল্লাল সেদিন দরবারে বসেছেন। পাত্র-মিত্র মন্ত্রী-পারিষদ সবাই হাজির।

'মহারাজ !'

'কে ?' বিস্ময়ের ঝকঝকে দৃষ্টি সবার চোখে।'

'মহারাজ, আপনার রাজ্যে এই অনাচার !'

এক বৃদ্ধ। বৃদ্ধ এসেছে রাজদরবারে। প্রজারঞ্জক রাজার কাছে। যুক্তকর। কাঁপছে। থরথর ক'রে কাঁপছে। এক চোখে জল। আর চোখে জ্বালা। জল আর আগুন পাশাপাশি। তার—তারই কণ্ঠ বাজছে শঙ্খের মতো।

'অনাচার ! অনাচার !'

'অনাচার !' চমকে উঠলেন বল্লাল। সিংহাসন থেকে নেমে এলেন। বৃদ্ধের কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'অনাচার ? আমার রাজ্যে অনাচার ! বৃদ্ধ তুমি কি বলছো।'

'সত্যি মহারাজ। নিষিদ্ধ মাংসে আমার কূপ অপবিত্র। কারা যেন অপবিত্র করেছে। দেব-বিগ্রহ ঘরে আমার। পূজো-আর্চায় জল চাই। পান করবার জল চাই। মহারাজ, নিষিদ্ধ মাংসে—'

'নিষিদ্ধ মাংসে!' কথাটা একবার উচ্চারণ ক'রেই থেমে গেলেন রাজা। মুখমণ্ডল টুকটুকে জবার মতো। ছ'টি চোখ জ্বলজ্বলে আগুনের মতো। দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ।

বৃদ্ধ আবার বললে, 'হুজুর আমাদের মা-বাপ। বাস করি হুজুরের দয়ায়। তাইতো হুজুরের—'

'যাও, আমি দেখছি।'

আচমকা বাজ পড়ার মতো কথা ক'টি বেরিয়ে গেলো বল্লালের কণ্ঠ থেকে। পারিষদরা বিপদ গণলেন। বুড়ো মন্ত্রী মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'তাই তো! এ যে দেখছি ভারি মুশকিল!'

বৃদ্ধ কৃতার্থ হয়ে চলে গেলো।

লোক ছুটলো পাড়ায় পাড়ায়। গ্রামে গ্রামে। বল্লালের কড়া হুকুম। ছুষ্কৃতকারীকে বার করতে হবে। তাকে শাস্তি দিতে হবে। বল্লালের রাজ্যে অন্যায়কারীর ক্ষমা নেই, কথাটা তাকে বুঝিয়ে দেওয়া চাই। ছুপুরের ভেতরই লোক এলো। খবর নিয়ে।

বললে, 'মহারাজ, সর্বনাশ হয়েছে। মুসলমান সেনা ছাউনি ফেলেছে। বেশী আর দূরের পথ কই! কাছের গ্রাম আবহুল্লাপুরে। নেতা তাদের বায়াছুম। লোকে বলে আদমবাবা। মস্তবড় বুজরুক। অদ্ভুত অদ্ভুত খেল দেখিয়ে লোককে সে মুগ্ধ করেছে। মহারাজ বিপদ উপস্থিত!

বিপদ উপস্থিত! হ্যাঁ, বিপদ উপস্থিত!

দেরি করলেন না বল্লাল সেন। ছুটে গেলেন অন্তঃপুরে। রণসজ্জা পরবার জন্যে।

অন্তঃপুরে খবর পৌঁছেছিল আগেই। শুধু খবর নয়। আরও কিছু। আরও অনেক। পুরনারীরা শুনেছিলেন, আদমবাবার বলের

কথা। ক্ষমতার কথা। একটা আশঙ্কার মেঘ তাই ছড়িয়ে পড়েছিল অন্তঃপুরে। একটা চাপা কান্নার গুঞ্জন উঠেছিল।

বল্লাল সেন অন্তঃপুরে যেতেই রানী এসে কাছে দাঁড়ালেন। ভীরু-প্রাণ বন-হরিণীর দু'খানি শঙ্কিত দৃষ্টি তুলে চাইলেন রাজার চোখের উপর। বললেন, 'না না। যেয়ো না। যেয়ো না গো।'

'সে কি কথা!' রাজা বললেন।

'ও যে মানুষ নয়। ও বুজরুক; ও ফকির—'

'হ্যাঁ, আমি তা জানি। জেনেই যুদ্ধে চলেছি। তোমার ভয় নেই। নিশ্চয়ই আমি জয়ী হয়ে ফিরবো।'

কিন্তু—কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো রানীর চোখ থেকে।

রাজা বললেন, 'যদি ফিরে না আসি, না?'

রানী কাঁদছেন। গোলাপ-ডুগডুগ কপোল বেয়ে জল পড়ছে অবিরল।

রাজা বললেন, 'ছিঃ, কেঁদো না। আমি রাজা। রাজ্য রক্ষা—প্রজার জীবন রক্ষা আমার ধর্ম। এ ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হলে আমার জীবন বৃথা। মিথ্যে অহঙ্কার আমার গৌরবের।'

রানী বুঝলেন। চোখ মুছলেন। ডাকলেন, 'নাথ!'

'রাজধর্ম বড় কঠিন রানী। মাথায় আমার সোনার মুকুট। লোকে তাই দেখে। কিন্তু আমি জানি, এ আমার কী বোঝা। কি গুরুদায়িত্ব এ ধারণ করার। মা স্নেহের আঁচলে ঢেকে রাখতে চাইলে সে-আঁচলকে সরিয়ে আসতে হয়। প্রিয়া আলিঙ্গনে ধরে রাখতে চাইলে সে-আলিঙ্গনকে ছাড়িয়ে আসতে হয়। রাজধর্ম মনোধর্মের চেয়েও বড়। মন আমার। তোমার। রাজা সবার।'

বলতে বলতে ছলছল ক'রে উঠলো বুঝি বল্লালের উজল দু'টি চোখও।

রানী আবার ডাকলেন, 'নাথ!'

'আমি—আমি আসি রানী!' রানীর চুলের অরণ্যে হাত বুলোতে বুলোতে বল্লাল সেন বললেন।

রানী জানালেন ঃ যাবে যাও। তোমার রাজ্য। তোমার প্রজা। যাবে বই কি! নিশ্চয় যাবে।

'রানী।'

'যদি তেমন একটা কিছু ঘটে, তা হলে আমার উপায় কি? যবনের হাতে ধর্ম ও মর্যাদা নষ্ট হওয়ার চেয়ে আমার মরণ ভালো।... তবে একটু দাঁড়াও। এক নিমেষ।'

বলে রানী তাঁর সাজঘরে গেলেন। সাজঘরের বাইরে বসা পোষা কপোত। রানী তাকে ধরে নিয়ে এলেন।

রাজা বললেন, 'এ কি! কপোত কেন?'

'আমার দূত। তোমার কাছে আমার দূত রইলো মহারাজ! এই কপোত যদি একা ফিরে আসে তা হলে বুঝবো তুমি—' বলতে বলতে কেঁপে উঠলো রানীর কণ্ঠ। জল টলমল ক'রে উঠলো চোখে। 'তা হলে বুঝবো, তোমার বিপদ হয়েছে। আমার তা হলে জীবনে কি কাজ! আমি আগুনের কুণ্ড জ্বেলে তাতে প্রাণ দেবো মহারাজ।'

বল্লাল বললেন,

'দুরাত্মযবনাৎ ধর্মং সতীত্বং রক্ষিতুং চ বৈ।
শ্রেয়ো মৃত্যুশ্চ যুষ্মাকং চিতাদাহেন নিশ্চিতং।
কপোত যুগলং দূতং মমামঙ্গল স্সূচকং।
পূর্ব প্রস্তুত চিতায়াং দৃষ্টৈব মরণং ধ্রুবং॥'

(গোপাল ভট্টঃ বল্লাল চরিত)

'হ্যাঁ, যবনের হাত থেকে ধর্ম ও সতীত্ব রক্ষা করতে হলে চিতাদাহে নিশ্চিত মৃত্যু বরণই তোমার পক্ষে শ্রেয়। আগে থেকেই চিতা প্রস্তুত ক'রে রেখো। আমার অমঙ্গলসূচক দূতরূপী—কপোতযুগলকে দেখলে সেই চিতানলে ধ্রুব মৃত্যু বরণ ক'রো।'

রানী ডাকলেন, 'মহারাজ!'

'না, আর না। আর পিছু ডেকো না গো। চোখের জলে আমার কর্তব্য ভোলাতে এসো না। আমার ধর্ম আর কর্তব্য আমায় ডাকছে রানী। আমি আসি। আমায় বিদায় দাও।'

'বিদায় ?'

কি যেন ভাবলেন রানী। কি যেন বুঝলেন। তার পর উচ্ছ্বসিত অশ্রুর আবেগে বললেন, 'বিদায় ? না, বিদায় নয়। বলছি এসো। শত্রু নিপাত ক'রে ফিরে এসো। আমি তোমার পথ চেয়ে বসে রইলাম।'

বল্লাল আর দাঁড়ালেন না। আদমবাবার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন।

আবদুল্লাপুরে ছাউনি পড়েছে আদমবাবার।

আদমবাবা একা নন। ভক্ত-শিষ্য, সৈন্যসামন্ত অনেক সঙ্গে রয়েছে তাঁর।

সন্ধ্যা হয় হয়। পশ্চিম আকাশ লালে লাল।

আদমবাবা নমাজ পড়ছিলেন।

হঠাৎ একটা কালো ঘোড়া টগবগ ক'রে শিবিরের বাইরে এসে থামলো।

ঘোড়া থেকে নামলেন এক বীরপুরুষ। মাথায় শিরস্ত্রাণ, বুকে বর্ম, কোমরে বাঁক-দেওয়া তলোয়ারখানি রূপোর খাপে ঝুলছে।

'কোথায়, কোথায় আদম। বায়াদম।'

আদমবাবার নমাজ সাঙ্গ হয়েছিল। শিবির থেকে তিনিই বেরিয়ে এলেন।

বললেন, 'কে ? কে আপনি ? কাকে চাই আপনার ?'

'বায়াদম কোথায় ? আদমসাহেব ?'

'আমিই বেয়াদম।'

'আমি বল্লাল সেন।'

বল্লাল সেন! আদমবাবার মুখমণ্ডলে কেমন যেন একটা চিন্তার ছাপ পড়লো। ভীত শঙ্কিত হয়ে তিনি এদিক্-ওদিক্ তাকালেন।

বল্লাল সেন বললেন, 'ভয় নেই আপনার। যদিও আমি আপনার সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার জন্যে এসেছি, তবুও হঠাৎ আক্রমণ করবো না আপনাকে। যান, তৈরী হয়ে আসুন। আপনার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ চাই। যদি জয়ী হন, বিক্রমপুরের সিংহাসন আপনার।'

যুদ্ধ শুরু হলো। অশ্বখুরের দাপটে ওঠা ধূলিতে চারিদিক্ যেন আঁধার হয়ে এলো। পইখ-পাখালিরা উড়ে পালালো দূর দূরান্তরে।

রাজা ধরলেন বাঁ হাতে রানীর দেওয়া সেই কপোত, ডান হাতে ক্ষুরধার তলোয়ার। তলোয়ারের ঝনঝনায় ভীত সন্ত্রস্ত কপোত এক একবার উড়ে যেতে চায়। বল্লাল তাকে চেপে ধরেন। বলেন, 'একা একা যাবি কেন? চল্, দু'জনেই যাবো। আর দেরি নেই।'

সত্যি আর দেরি নেই।

অনেকক্ষণ লড়াই ক'রে আহত-ক্লান্ত আদমবাবা মাটিতে গড়িয়ে পড়লেন।

বল্লাল লাফিয়ে পড়লেন তাঁর উপর। কোপের পর কোপ চালালেন। পিচকারির রঙের মতো রক্ত ছুটলো। বল্লালের দেহবাস রাঙা হলো। কিন্তু তবু না। তবুও আদমবাবার প্রাণ বেরুলো না।

আশ্চর্য! আশ্চর্য মনে হলো বল্লাল সেনের।

আদমবাবা বললেন, 'আপনার তলোয়ারে তো আমি মরবো না মহারাজ। আমার মৃত্যু আমার তলোয়ারে।' করুণ মিষ্টি কণ্ঠ আদমবাবার।

বল্লাল সেন তাই করলেন। মাটি থেকে আদমবাবার তলোয়ার-খানি কুড়িয়ে নিলেন। তার পর আঘাত করলেন সজোরে।

শেষ। সব শেষ।

কয়েকবার 'আল্লার' নাম, 'রসুলের' নাম নিলেন আদমবাবা।

বললেন, 'খোদা, তোমার ইচ্ছে পূর্ণ হোক। আমার আত্মদানে তোমার নাম লেখা হোক। ইসলামের জয় হোক।'

আদমবাবা চোখ বুজলেন।

এবার উঠে দাঁড়ালেন বল্লাল সেন। রক্তে রাঙা হয়ে গেছে পরিচ্ছদ। রক্তাক্ত হাত-মুখ। চোখের পাতায়ও রক্তের ছোপ। ঝাপসা তাঁর দৃষ্টি।

হাত-মুখ ধোবার জন্যে তিনি একটি দীঘিতে নামলেন।

কিন্তু কপোত? রানীর দূত কপোত?

এক মুহূর্ত—এক নিমেষের ভুলে কপোত উড়ে গেছে আকাশে। আকাশে পাখা বাজিয়ে সে ছুটেছে রাজপুরীর দিকে। বল্লাল আর দেরি করলেন না। হাত-মুখ আর ধোয়া হলো না। ঘোড়া নিয়ে ছুটলেন তিনি রানীর দূত কপোতের পিছু পিছু। কিন্তু প্রাসাদে গিয়ে যখন পৌঁছুলেন তখন সব শেষ হয়ে গেছে।

অগ্নিকুণ্ডে ছাই হয়ে গেছে পুরললনাদের রূপ-যৌবন, দেহ-জীবন।

বল্লাল চীৎকার ক'রে ডাকলেন, 'রানী! রানী!'

দিগন্তের কিনার থেকে, আম-কাঁঠাল গাছের মাথার উপর দিয়ে শুধু প্রতিধ্বনি ফিরে এলো। আর কিছু নয়। কিছুই নয়। বল্লাল অগ্নিকুণ্ডের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

সপ্তশিখায় তখনও জ্বলছে বৈশ্বানর। সাপের জিবের মতো তখনও তার শিখা লকলক করছে। বল্লাল কি ভাবলেন। কি বুঝলেন। এক সময় তিনি নিজেও সেই অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করলেন।

তার পর শেষ। সব শেষ। শুধু প্রজাদের বুকফাটা কান্নার শব্দে আকাশ এক সময় মুখর হয়ে উঠেছিল। আর সবই নিস্তব্ধ

এই সেই অগ্নিকুণ্ড। এই সে কলঙ্কের কালীদহ।

পথচারীরা পথে যেতে যেতে আজও এর দিকে চায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে। অনেক সন্ধ্যা, অনেক রাতের আসর 'পোড়া রাজা'র কাহিনীতে সজল হয়ে ওঠে।

দিন যায়। কাল যায়। দিনে দিনে অনেক কিছুই বদলায়। কিন্তু পোড়া রাজার কথা কারো মন থেকে মোছে না। মোছবার উপায় নেই।

অগ্নিকুণ্ডে বাসন মাজতে এসে 'পুরনো' 'নতুন'কে বলে :

'এই তো, এইখেনে। এইখেনেই তো রাজা-রানী পুইড়া মইলো। তাই তো এর নাম অগ্নিকুণ্ড। আহাগো রাজা-রানীর কপাল!'

মুখে মুখে কথা গড়ায়।

আজ-কাল-পরশুর দিকে। এইভাবে।

সেই স্মরণীয় উপহার



ভোরের মিষ্টি রোদ। শিশির ভেজা পাতায় পাতায় কাঁপছে। নাচছে। মুক্তোর মতো ঝিলমিল করছে। সেই সোনার গুঁড়ো রোদ পড়েছে শেঠ-প্রাসাদের অলিন্দে। চকচকে অলিন্দ ঝকমক করছে।

অসামান্যা অলিন্দে দাঁড়িয়েছিল। অগুছালো বেশ। অগুছালো চুল। অবিন্যস্ত নিরাভরণ রূপ। ঘুম জড়ানো ঢলঢলে দু'টি চোখ মেলে বাইরে তাকিয়েছিল অসামান্যা। ভোরের ঝিরঝিরে হাওয়ায় আকাশি রঙের শাড়ির আঁচল ফুলে ফুলে উঠছে। বার বার তাকে

সংযত করতে চাইছে সে। পারছে না। ভোরের হাওয়া তার সঙ্গে যেন লুকোচুরি খেলছে। কি একটা অনুভূতিতে সোনামাজা মুখ লাল হয়ে উঠছে অসামান্যার। হলুদ রোদে তা আরও যেন অপূর্ব হয়ে উঠছে। ঘুম-মাখা চোখের কালো কালো ছু'টি তারা আরও যেন গাঢ় হয়ে আসছে।

হঠাৎ রাস্তায় চোখ পড়লো অসামান্যার।

শেঠ-প্রাসাদের কিনার দিয়ে গড়িয়ে গেছে সোজা মেঠো রাস্তা। গড়িয়ে গড়িয়ে হারিয়ে গেছে অনেক দূরে। সেই বড় রাস্তায় একটি জুড়িগাড়ি ঝম্ ক'রে এসে থামলো। গাড়ি থেকে নামলো এক সুবেশ তরুণ। শুধু নামলো না—তার চমক-লাগা ছু'টি চোখ যেন থির হয়ে রইলো। তার ছু'টি মাতাল দৃষ্টি আটকে রইলো শেঠ-প্রাসাদের অলিন্দের মধ্যে। সূর্যমুখী অসামান্যার সূর্যপ্রভ একখানি সোনালী মুখের দিকে। সে-দৃষ্টি এতো তীক্ষ্ণ, এতো গভীর যে, সে যেন এক মুহূর্তে রূপবতী অসামান্যার সমস্ত অঙ্গ জরিপ ক'রে নিল।

চমকে উঠলো অসামান্যা। সারাটা গা যেন সিরসির ক'রে উঠলো তার। রক্তের বেগ বাড়লো দপ্‌দপ ক'রে। বিস্ময়ে একটা কথা মুখ থেকে বেরিয়ে গেলো তার ঃ 'নবাব !'

নবাব সিরাজদ্দৌলা দাঁড়িয়েছিল। স্থির। স্তব্ধ। ছু'টি চোখে তার কি যেন অশুভ প্রত্যাশা।

হাওয়ায় ওড়ানো শাড়ির আঁচলটাকে সংযত ক'রে নিলে অসামান্যা। একটা আগুনের হলকা যেন এক নিমিষে তার পা থেকে মাথার দিকে উঠে গেলো। দৌড়ে ভেতরে পালালো সে।

এবারে চোখ ফেরালে সিরাজদ্দৌলা। একটা স্বপ্ন—একটা বিদ্যুৎ যেন সরে গেলো তার চোখের সমুখ থেকে।

'জাহাঁপনা !'

'কে ?'

'আমি।'

'শেঠজি ?'

জগৎ শেঠ কাছে এসেছে। দূর থেকেই দেখেছে সে নবাবকে। অবাক হয়েছে। সন্দেহ করেছে। তাই ছুটে এসেছে তাড়াতাড়ি।

'জাহাঁপনা !'

'ভারি সুন্দর ফুল ফুটেছে শেঠজি। আপনার প্রাসাদ যেন আলো করেছে। তাইতো দাঁড়িয়েছিলাম। মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম।'

'আমি ভাগ্যবান জাহাঁপনা।' বলে জগৎ শেঠ একটু হাসলে। সে-হাসির অর্থ সিরাজ বুঝতে পারলে না।

বললে, 'এক-একবার মনে হয় তামাম মুর্শিদাবাদকে ফুলবাগ ক'রে দি'। আলো করে দি'। কিন্তু...'

বলতে বলতে হঠাৎ যেন থামলে সিরাজ। তার দু'টি চঞ্চল চোখের দৃষ্টি উড়ে গেলো শেঠ-প্রাসাদের গবাক্ষের দিকে। গবাক্ষের ওপাশে সেই নীল শাড়ির নীল জমিন আবার ফুরফুরে হাওয়ায় কাঁপছে।

জগৎ শেঠ বুঝলে। হাসলে একবার। বললে, 'ও আমার কন্যা জাহাঁপনা—অসামান্যা।'

সিরাজের মুখমণ্ডল হঠাৎ একবার লাল হয়েই আবার যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। শরীরটা একবার যেন শিউরে উঠলো। চোখ দু'টি ফিরিয়ে নিলে সে। বললে, 'না, না, আমি তা বলি নি —তা বলি নি। তবে কি জানেন—আপনার এই ফুলবাগ আমার বড় ভালো লাগছিল। মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাই তাকিয়েছিলাম।'

জগৎ শেঠের মুখে আবার হাসির ঢেউ গড়িয়ে গেলো। সিরাজ গিয়ে গাড়িতে উঠলো। ঘোড়া ছুটলো টগবগিয়ে রাস্তার দু'ধার কাঁপিয়ে।

অসামান্যা। অসামান্যা।

একটি নাম যেন মন্ত্রের মতো বাজছে সিরাজের কানে। একটি সূর্যমুখী মুখ যেন জ্বলছে সিরাজের স্বপ্নে। অসামান্যা। অসামান্যাকে পেতে হবে। আপন ক'রে পেতে হবে। নইলে জীবনের স্বাদই ব্যর্থ হয়ে যাবে সিরাজের।

কিন্তু? কিন্তু তাকে পাবার উপায় কি?

জগৎ শেঠের কন্যা অসামান্যা। ধনকুবেরের কন্যা। ধন দিয়ে তো তার মন গলানো যাবে না। তবে? তবে উপায় কি? কেমন ক'রে তাকে পাওয়া যাবে? ভাবতে ভাবতে সিরাজের চোখের ঘুম উড়ে গেলো। রঙ-তামাশা বন্ধ হলো। নেশায় নেশায় রোজই জগৎ শেঠের বাড়ির কাছ দিয়ে যেতে লাগলো সিরাজ। কিন্তু অসামান্যার দেখা আর মিললো না।

একদিন।

অন্ধকার রাত। মিশকালো অন্ধকারে যেন লেপটে গেছে সারা পৃথিবী। ঢেকে গেছে ধনকুবের জগৎ শেঠের বিরাট প্রাসাদ। ভেতরে আলো জ্বলছে। কিন্তু তা বাইরে আসতে আসতেই হারিয়ে গেছে। অন্ধকারের বিদকুটে চেহারাটা দেখে বুঝি তা আর এগুতে সাহস করে নি। বাইরে তাই অন্ধকার।

সেই অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে এক তরুণী ঢুকে পড়লো জগৎ শেঠের প্রাসাদে। মন্থর গতি। সরম জড়ানো মুখাবয়ব। হয়তো কোন ধনী-মানীর কন্যা। দ্বাররক্ষীরা বাধা দিলে না। তরুণী ভেতরে চলে গেলো।

অসামান্যা ছিল ঘরে। জানালার ধারে। দেখছিল কালোর কালি-মাজা আকাশটাকে। আর ফুলঝুরির মতো দপ্‌দপ ক'রে জ্বলা অসংখ্য তারার মালাকে। স্বামী ঘরে আসে নি। শূন্য বাসর। প্রতিক্ষা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে।

খুঁজতে খুঁজতে সেই তরুণী অসামান্যার ঘরে গিয়েই ঢুকলো। প্রথমটায় চমকে উঠেছিল অসামান্যা। কিন্তু নারীমূর্তি দেখে অনেকটা আশ্বস্ত হলো।

বললে, 'কে তুমি ভাই? এসো না, কি বলতে চাও বলো না।'

সাহস পেলে তরুণী। এগিয়ে এলো অসামান্যার কাছে। সেই জানালার পাশে। জড়িয়ে ধরলে পাখীর বুকের মতো নরম অসামান্যার ছু'খানি হাত।

অসামান্যা আঁতকে উঠলো।

শক্ত মুঠো। এ হাত তো রমণীর নয়! নিশ্চয়ই কোন লম্পটের।

তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দূরে সরে দাঁড়ালো অসামান্যা। বাতিটা দিলে বাড়িয়ে। আলো আছড়ে পড়লো ঘরে। নবাগতার মুখে। সে আলোতে অসামান্যা আগন্তুককে চিনলে। চীৎকার ক'রে বললে, 'নবাব! আপনি? আপনি এ কি করলেন? একি করলেন নবাব?'

বলতে বলতে ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললে অসামান্যা। তার গোলাপ টুকটুক ছু'খানি কপোল বেয়ে নেমে এলো জলের ধারা।

সিরাজ আর দাঁড়ায় নি। ছুটে পালাচ্ছিল। কিন্তু পারলে না। শাড়ির আঁচল জড়িয়ে পড়ে গেলো মাটিতে। শেঠের লোকজনেরা ধরে ফেললে তাকে। আঘাত করলে। পাতুকাঘাত। তার পর কান মুলে টেনে বার ক'রে দিলে শেঠ-প্রাসাদের আঙিনা থেকে।

বাইরে এসে সিরাজ যেন হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। তার পিঠ জ্বলছে আর চোখ জ্বলছে। সঙ্গে সঙ্গে মন জ্বলছে।

কিছুদিন কাটলো।

সে-রাতের সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা অসামান্যার মন থেকে মুছে গেলো। আবার সে অলিন্দে দাঁড়ায়। গান গায়, সুখিদের নিয়ে রঙ্গ করে।

একদিন সোনার থালায় রেশমী রুমালে ঢাকা এক উপহার নিয়ে এক পরিচারিকা উপস্থিত।

'ওমা, কে গো তুমি? কোত্থেকে এলে? থালায় কি এনেছো?'

হেসে হেসেই কথা ক'টি বললে অসামান্যা।

পরিচারিকা বললে, 'এনু তোমার সই-এর কাছ থেকে গো। বললে, পচার মা, যা এই থালাটা সই-এর কাছে দিয়ে আয়। আমরা যে আবার না করতে নারি। তাই ছুটে এনুগো।' বলতে বলতে পরিচারিকা থালাটি মাটিতে রাখলে। প্রণাম করলে অসামান্যাকে। তার পর ধীরে ধীরে পা বাড়ালে বাইরের দিকে।

অসামান্যা ডাকলে, 'ও মা, সে কি কথা গো। ও পচার মা—তোমার এ কি ধারা বাপু! সই-এর কাছ থেকে এলে আর বলা নেই কওয়া নেই অমনি চলে যাচ্ছো। ও পচার মা, শোন! এসো এদিক্ পানে।' বলতে বলতে অসামান্যা এগিয়ে এলো দরজার দিকে।

কিন্তু কোথায় পচার মা। সোনার থালাটি মাটিতে রেখেই সে যেন একেবারে ছুটে পালিয়েছে।

কেমন যেন সন্দেহ হলো অসামান্যার। দরজার কাছে দাঁড়িয়েই মনে মনে কি যেন ভাবলে সে। তার পর ঘরে এসে সোনার থালার রেশমী রুমালটি উঠিয়ে নিলে। সোনার থালায় তার স্বামীর রক্তাক্ত ছিন্ন মুণ্ড। বীভৎস!

একটা তীব্র চীৎকার ক'রে মাটিতে গড়িয়ে পড়লো অসামান্যা।

রক্তের বিনিময়ে



পাগল হয়েছে অসামান্যা। শেঠ দুহিতা অসামান্যা। সোনার থালায় স্বামীর ছিন্ন শির দেখে জ্ঞান হারিয়েছিল সে। সে-জ্ঞান ফিরেছে। কিন্তু ফেরে নি তার বুদ্ধি। সুস্থ হয় নি মন। রূপবতী অসামান্যা আজ পাগলিনী। থেকে থেকে কেঁদে ওঠে সে। হুহু ক'রে কেঁদে ওঠে। জলের ধারায় গাল ভিজে তার। বুক ভিজে।

সখীরা শুধোয়, 'ও কি হলো? কাঁদছিস কেন লো?'

ডাগর ডাগর টানা টানা দু'টি চোখ তুলে চেয়ে থাকে অসামান্যা। ভাসা ভাসা দৃষ্টি। অর্থহীন অবুঝ চাউনি। সেই চাউনির গ্রাসে যেন তলিয়ে দিতে চায় সখীদের।

সখীরা ভয় পায়। হয়তো একটু ঘুরে বসে। নয়তো একটু দূরে যায়।

অসামান্যার চোখ থেকে এবার আগুন ঝরে! জবা ডুগডুগ তার কপোল দু'টি আরও যেন লাল হয়ে ওঠে। আলুথালু চুলের অরণ্যে কয়েকবার হাত চালায় সে। মুঠোয় মুঠোয় চুল টানে। যেন টেনে ছিঁড়ে ফেলতে চায়।

সখীরা ছুটে আসে।

একটা তীব্র চীৎকারে আবার আঙিনায় গড়িয়ে পড়ে অসামান্যা। জ্ঞান হারায়। তার সোনা-মাজা দেহবল্লরীতে ঘামের কুসুম চিকমিক করে।

এমনিভাবেই দিন কাটে। মাস কাটে।

জগৎ শেঠের চোখে ঘুম নেই।

অসামান্যা পাগল হয়েছে। ঘুম উড়ে গেছে জগৎ শেঠের চোখ থেকে।

দেশ-বিদেশে লোক পাঠিয়েছেন তিনি কবরেজ-বদ্যি আনানোর জন্যে।

লোক ফিরেছে। বদ্যি এসেছে। নিদান মতে বিধান হয়েছে। ওষুধ পড়েছে। কিন্তু অসামান্যার কোন পরিবর্তন হয় নি।

দেখে দেখে জগৎ শেঠ প্রায় আশা ছেড়েছেন। না, কোন লাভ নেই। ভালো হওয়ার কোন লক্ষণ নেই। দুঃখিনী কন্যার দুঃখ এ জীবনে বুঝি ঘুচবে না।

জগৎ শেঠের উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস শেঠ-মহলের কার্নিসে কার্নিসে বাড়ি খেয়ে হুহু ক'রে দূরে ছুটেছে। নিদ্রাহীন অস্বস্তিভরা রাত কাটিয়েছেন জগৎ শেঠ। আর মনে মনে একটি ব্যক্তির সর্বনাশ কামনা করেছেন তিনি। সে-ব্যক্তি নবাব সিরাজদ্দৌলা।

ক্রমে দু'বছর কাটলো। গঙ্গার জল অনেক দূর গড়ালো। অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো।

পলাশীর যুদ্ধে ভাগ্যবিপর্যয় হলো সিরাজের। ছুটে পালালো সিরাজ। মান খুইয়ে প্রাণ নিয়ে ছুটলো। কিন্তু সে-প্রাণও বাঁচলো না। ভগবানগোলায় ধরা পড়লো সিরাজ। প্রাণ হারালে মোহাম্মদী বেগের হাতে। তার মৃতদেহ হাতীর পিঠে বেঁধে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসা হলো।

হাতী চলেছে ধীরে।

পিঠে তার হতভাগ্য সিরাজের ছিন্নশির। মৃতদেহ। তামাম মুর্শিদাবাদবাসীর চোখের উপর দিয়ে হাতী চলেছে ধীরে ধীরে।

আজ অনেক দিন পরে এসে অলিন্দে দাঁড়িয়েছে অসামান্যা। রাস্তার কলরব বুঝি তাকে আকর্ষণ করেছে।

সখীরা—সঙ্গীরা বাধা দিয়েছে।

কিন্তু অসামান্যা কারো কথা শোনে নি। কারো বাধা মানে নি। সঙ্গীরা জড়িয়ে ধরলে খিলখিল ক'রে হেসে উঠেছে অসামান্যা। হাত ছাড়িয়ে নিয়েছে। দৌড়ে এসে দাঁড়িয়েছে অলিন্দে। রাস্তার পাশে। সঙ্গীরাও সঙ্গে সঙ্গে এসেছে।

হাতী চলেছে শেঠ-মহলের কাছ দিয়ে। অলিন্দে দাঁড়িয়ে সব কিছুই দেখা যায়। ঐ, ঐ হতভাগ্য সিরাজের ছিন্নমুণ্ড। ঐ, ঐ তার মৃতদেহ। রক্তে রক্তে অনুরঞ্জিত নবাবের কচি মুখখানি।

লোক ছুটেছে হাতীর পিছু পিছু হইহই, রইরই কলরব ক'রে। কেউ ঢিল ছুঁড়ছে, কেউ জুতো ছুঁড়ছে। কেউ ধিনধিন ক'রে নেচে নেচে মনের জ্বালা মেটাচ্ছে।

সেই ভাসা ভাসা হু'টি চোখ মেলে সেদিকেই তাকিয়েছিল অসামান্যা। চোখে পলক নেই। থির। যেন থমকে থাকা কাজল দীঘি।

হঠাৎ সে-দৃষ্টি এসে আছড়ে পড়লো সিরাজের ছিন্ন মুণ্ডের উপর।

থমকে থাকা অসামান্যা চমকে উঠলো। দেহে যেন তার ঢেউ খেলে গেলো। থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো অসামান্যা। বললে, 'কার, ও কার ছিন্নমুণ্ড?'

সঙ্গীদের একজন বললে, 'কার ছিন্নশির দেখলে তুমি খুশী হও সই?'

সখীর এ কথা শুনে আরও যেন ক্ষেপে গেলো অসামান্যা। তার দেহের কম্পন আরও যেন বেড়ে গেলো। চীৎকার ক'রে বললে, 'ও কার—ও কার ছিন্নশির?'

'তোমার স্বামীর হত্যাকারী শয়তান সিরাজের।'

'এ্যাঁ—নবাবের ?' বলেই চীৎকার ক'রে অলিন্দে গড়িয়ে পড়লো অসামান্যা। জ্ঞান ফিরলে দেখা গেলো অসামান্যা একেবারে সেরে উঠেছে।

হ্যাঁ, সেরে উঠেছে অসামান্যা। একটা দুঃস্বপ্ন যেন সরে গেছে তার চোখের সমুখ থেকে।

জগৎ শেঠ বলেন, 'আঃ, বাঁচালি মা। তোর জন্যেই তো—'

কথা কেড়ে নেয় অসামান্যা। ঘন কালো দু'টি চোখের তারা জগৎ শেঠের মুখের উপর তুলে ধরে। বলে, 'সে আমি জানি বাবা। আমার চিন্তায় তোমার মনে শান্তি নেই। চোখে ঘুম নেই। আমার জন্যে তোমার ভাবনার আর শেষ নেই।'

ছোট্ট একটু হাসি খেলে যায় জগৎ শেঠের ভারি ভারি দু'টি ঠোঁটে। অসামান্যার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, 'ওরে, তুই যে আমার সব, তুই যে আমার সব।'

অসামান্যার মাথাটা আপনা থেকেই নীচু হয়ে আসে।

সিরাজ-মহিষী মেহেরুন্নিসার কথা একদিন শুনলে অসামান্যা। শুনলে, বড় দুঃখে আছে মেহেরুন্নিসা। ছোট্ট একটি মেয়ে নিয়ে ভগবানগোলায় পালিয়ে পালিয়ে ফিরছে।

কথাটা মনে লাগলো অসামান্যার। ব্যথা পেলে সে। নিজেই বেরিয়ে পড়লো ভগবানগোলায়। মেহেরুন্নিসার সন্ধানে।

আকাশ সেদিন মেঘকজ্জল। অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টি। দুরন্ত ঝড়ের দাপাদাপি চারিদিকে।

মেহেরুন্নিসা শুনলে, কে যেন তার অনুসন্ধান করছে। শুনে বড় ভয় পেলে মেহেরুন্নিসা। ঘরে আর দেরি করলে না। ছোট্ট মেয়েটিকে বুকের আড়াল ক'রে পথে বেরিয়ে পড়লো।

কিন্তু ভগবানগোলায় ঠাঁই কোথায়? চারিদিকে শত্রুর চর। এখানে তো থাকা সম্ভব নয়। তাই ভগবানগোলা ছেড়ে যাবার সঙ্কল্প করলে মেহেরুন্নিসা। নদীতে দুরন্ত তুফান। ঢেউ-এর মাতামাতি। সেই দুর্যোগেই নৌকায় উঠলো মেহেরুন্নিসা। একটু দমলো না। বুকটা একটু কাঁপলো না। ছোট্ট মেয়ের ফুটফুটে মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু বললে, 'আমার জন্যে ভাবিনে, আমার যত ভাবনা সে শুধু তোর জন্যে। তুই যে আমার রক্ষিত ধন। তুই যে আমার পরম বিশ্বাস।'

বলতে বলতে বৃষ্টিধারার মতো ফোঁটায় ফোঁটায় জল গড়িয়ে পড়ে মেহেরুন্নিসার চোখ থেকে। নৌকা এগিয়ে চলে।

কিন্তু না। বেশী দূর যেতে পারলে না মেহেরুন্নিসা। দুরন্ত ঝড়ে নৌকা ডুবে গেলো। মেয়ে বুকে নিয়ে ছিটকে পড়লো মেহেরুন্নিসা। পাড়ের লোকজন এগিয়ে গিয়ে তাদের তুলে নিয়ে এলো।

অসামান্যার সামনেই পড়ে আছে মেহেরুন্নিসা। সংজ্ঞাহীন। পড়ে আছে তার ফুটফুটে কন্যা। অসামান্যা ডাকলে, 'গুল (গোলাপ) বিবি।'

সিরাজ আদর ক'রে এই নাম ধরেই মেহেরুন্নিসাকে ডাকতো।

মেহেরুন্নিসার মুখে কথা নেই।

অসামান্যা আবার ডাকলে, 'গুল বিবি।'

আকাশের বিদ্যুৎ ঝলকের মতো হঠাৎ যেন একবার জ্ঞান ফিরে এলো মেহেরুন্নিসার। চোখ মেলে চাইলে সে। বললে, 'কে?'

'আমি। অসামান্যা।'

অসামান্যার নাম শুনেছে মেহেরুন্নিসা। বললে, 'আপনি? আপনি এসেছেন।'

'হ্যাঁ, আমি এলাম গুল বিবি।'

'ভালোই হলো। আমার কন্যাকে একলা ফেলে নিশ্চিন্তে মরতে পারছিলাম না। আপনার কাছে আমার কন্যাকে রেখে গেলাম।'

বলতে বলতে আবার চোখ বুজলো মেহেরুন্নিসা। সে-চোখ আর খুললো না।

অসামান্যা এবার সিরাজের কন্যাকে দেখলে। ফুটফুটে মুখ। ঝকঝকে রঙ। সুন্দর, মনোহর।

হঠাৎ কেমন যেন হয়ে গেলো অসামান্যা। মনটা কেমন যেন টনটন ক'রে উঠলো তার। মেয়েটিকে সে বুকে তুলে নিলে। আর মুর্শিদাবাদে ফিরলে না। স্বামীর হত্যাকারীর কন্যাকে মানুষ ক'রে তোলবার জন্যে পূর্ব বাঙলার পথে বাড়ালে।

ছবি খাঁর জাঙ্গাল



লোকে বলে জাঙ্গাল। ছবি খাঁর জাঙ্গাল।

যশোর খুলনা ফরিদপুর দিয়ে বড় বড় অনেকগুলো পথ এদিক্ ওদিক্ ছুটে গেছে। কতো কালের—কতো দিনের পুরনো সব পথ। তাদের জন্ম-লগ্নের কাহিনী কেউ জানে না। কেউ বলতে পারে না।

তবে মুখে মুখে নানা কথা ছড়ায়।

দিন যায়। কাল যায়। কতো ভাঙে। কতো ফুরোয়। কিন্তু শেষ হয় না শুধু এই চলতি পথের পদাবলী। এ-গাঁও থেকে ও-গাঁও। ও-গাঁও থেকে সে-গাঁও ছুঁয়ে উধাও পথ উধাও হয়।

লোকে দেখে। আর অবাক বনে। পথ চলে। আর বলাবলি করে। তাদের মনে, তাদের কথায় একটি নামই শুধু ঝিলিক দেয়।

নীলে-মাজা আকাশে সন্ধ্যা তারার মতো একটি নামই ঝিলমিল ক'রে ওঠে।

ছবি খাঁ। ছবি খাঁ।

রাজার কথা নয়। বাদশার কথা নয়। ইতিহাসের এক করুণ কাহিনীর হতভাগ্য নায়ক তাদের স্মরণ পথে উঁকি দেয়। তারা আপসোস করে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তার পর বট-অশ্বত্থের ছায়ার চাদর মোড়া ছবি খাঁর পথ—ছবি খাঁর জাঙ্গাল ধরে সোজা এগোয়।

যশোর থেকে খুলনা। খুলনা থেকে ফরিদপুর। বহু দূর।

অনেক কালের কথা।

মেহেন্দীগঞ্জের একটি মসজিদের গায়ে ছবি খাঁর নাম আছে। আর আছে সেই মসজিদের জন্মকালের ঘোষণা—১১৬১ সাল।

আজকের কাহিনী তারও আগের ঘটনা।

একদিন।

একদিন ছোট্ট এক গাঁয়ের মস্ত এক বাড়িতে কান্না উঠলো।

'কি? কি? ব্যাপার কি? কাঁদছো কেন? কি হয়েছে?'

ঝাঁকে ঝাঁকে প্রশ্ন এলো কৌতূহলী প্রতিবেশীদের কাছ থেকে। বাড়ির মালিক এক মুসলমান ভদ্রলোক। পশ্চিম দেশের মানুষ। স্ত্রী তার যুবতী। রূপবতী।

স্বামী-স্ত্রী। যুবক-যুবতী। কাঁদছিল। মাটিতে গড়িয়ে কাঁদছিল।

'খোকারে! চক্ষের মণিরে! সোনার চান্দরে!'

সে কান্না ঘরের চালে বাড়ি খেয়ে, গাছ-গাছালির মাথা গড়িয়ে দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ছিল। ঝড়ের রাতে মেঘনা নদী—ইল্‌সা নদী যেমন ক'রে দাপায়, স্বামী-স্ত্রী তেমনিভাবে দাপিয়ে দাপিয়ে মাথা খুঁড়ছিল দাওয়ার মাটিতে।

'চক্ষের মাণিক রে। আন্ধার ঘরের চান্দরে আমার।'

'কি হলো? কান্দচো কেন! কি হলো খোকার!' করুণ কণ্ঠ প্রতিবেশীর। চোখের জলের ছোঁয়াচে তার চোখও টলমল।

স্বামী বললে। কেঁদে কেঁদে বললে, 'এলে? এতক্ষণে এলে তুমি চাচা! নাই। খোকা নাই। আমার আন্ধার ঘরের চান্দ নাই।'

'নাই?' চমকে উঠলো চাচা সা'ব। বললে, 'নাই? নাই তো কি হলো? কোথায় গেলো?'

'কি জানি। ঘরে ফিরলাম। ডাকলাম খোকার মাকে। ঘাটে ছিল খোকার মা। ডাক শুনে এলো। কিন্তু খোকা? খোকা কই? শূন্য কাঁথা খাঁখাঁ করছে। শূন্য ঘর ভাঁভাঁ করছে। খোকা নাই। কোথাও নাই চাচা সা'ব। খোকা আমার—' বলতে বলতে স্বামী মাথা ঠুকলো মাটিতে। স্ত্রী বুক চাপড়ালো। জ্ঞান হারালো। গাঁয়ে পড়লো হুলস্থুল।

লোক ছুটলো এখানে সেখানে। ঝোপে ঝাড়ে। খালে-বিলে। শেয়াল আছে। বাঘ আছে। কোন কিছুতে যদি—

না। শেয়ালে নয়। বাঘে নয়। জীব-জানোয়ার কোন কিছুতেই নয়। খোকাকে নিয়ে পালিয়েছে ছেলেধরারা। নিশ্চয় ওরা। সারা বাঙলা জুড়ে ওদের উৎপাত। এ কাজ ওদেরই।

দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মিলিয়ে, চোখের জলে মাটি ভিজিয়ে প্রতিবেশীরা ঘরে ফিরলো।

স্বামী-স্ত্রীর চোখে আঁধার। বুকে ঝড়। মেঘনা নদী, ইল্‌সা নদীর দাপাদাপি।

প্রতিবেশীরা মিথ্যে বলে নি। ও কাজ ছেলেধরাদের। ছেলে-ধরারাই চুরি করেছে খোকাকে। নিয়ে পালিয়েছে। কিন্তু তারা ধরে রাখে নি। নিজেদের ঘরে রাখে নি তাকে।

দূর গাঁয়ের এক মুসলমান। মস্ত বড় ধনী। কিন্তু একটি ধনই নেই শুধু। পুত্র-ধন। সেই এক ধন অভাবেই সে কাঙাল।

সব থেকেও যেন কিছু নেই। সেই কথাটা—সেই ব্যথাটাই মনে তার বাজে। শূন্য পৃথিবী, জীবনটাকেই তার শূন্য বলে মনে হয়।

ছেলেধরারা তা জানে। সব খবরই তারা রাখে। তাই, তার সঙ্গেই গোপনে কথা চালিয়ে শিশুটিকে নিয়ে হাজির করলে একদিন।

সুন্দর! ফুটফুটে সুন্দর শিশু। বরণ-গড়ন সব সুন্দর। যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়া আলো। মাটির ঘরে এক টুকরো চাঁদ।

দেখলে। মুগ্ধ হলো সাহেব।

বললে, 'দাও, দাও। আমায় দাও। ওর জন্যেই রয়েছি। ওর জন্যেই কেঁদেছি। ওকে আমার ছেলে করবো। ও আমার ঘর ভরবে। খোদা তাই ওকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন।

'বিনিময়?'

'বিনিময় দেবো। তোমাদের খুশী করবো। কি চাই তোমাদের? কতো অর্থ চাই! বলো! বলো!'

ছেলেধরাদের হাতে চাঁদ। সুযোগ বুঝে তারা দর হাঁকলে মোটা রকমের। ছেলে তো আর যা-তা নয়!

সাহেব তাতেই রাজী। টাকার জন্যে ছেলে ছাড়বে? না। তা হয় না। ছেলেধরার হাতে মোটা টাকা গুঁজে দিয়ে সাহেব ছেলেকে কোলে নিলে। ছবির মতো ফুটফুটে চেহারা। নাম রাখলে তাই ছবি। ছবি খাঁ। মেঘের শেষে মিষ্টি রোদ যেমন ক'রে হাসে, সাহেবের ঠোঁটে তেমনি এক টুকরো মিষ্টি হাসি। অনেক—অনেক দিন পরে।

সেই ছেলে বড় হলো। শৈশব থেকে কৈশোর।

কৈশোর গিয়ে এলো যৌবন।

তারই হাতে সব সঁপে দিয়ে একদিন চোখ বুজলো তার পালক পিতা।

ছবি খাঁ দেখলে, সে আর সামান্য ছবি খাঁ-টি নয়। আজ সে মস্ত ধনী। অনেক সম্পদের মালিক। দু'হাতে টাকা ওড়ালেও বুঝি সে-সম্পদ কোনকালে ফুরোবে না। বন্ধু জুটলো, মোসাহেব জুটলো। জলের মতো টাকা ঢালছে ছবি খাঁ। দিন তার সুখেই কাটছে।

একদিন।

একদিন শিকারে গেছে ছবি খাঁ। দূরের এক বনে। পাত্র-মিত্র নিয়ে। ঘুরতে ঘুরতে সে একটা জায়গায় এসে দাঁড়ালো। জায়গাটা অনেক ফাঁকা। অনেক দূর দৃষ্টি যায়।

এখানে দাঁড়িয়ে এদিক্ ওদিক্ দেখছিল ছবি খাঁ। হঠাৎ তার দৃষ্টি গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো দূরের এক গাছের তলায়। চমকে উঠলো সে। মনে মনে বললে, 'কে? কে ওখানে? নারী? নারী এ ঘোর বনে?'

কৌতূহল বাড়লো ছবি খাঁর। পা বাড়ালো সেদিকে।

'কে? কে ওখানে?'

জলভরা দু'খানি টলমল আঁখি তুলে চাইলো এক রমণী। বললে, 'আমি, আমি। পাশের গাঁয়ের বৌ।'

রমণীর গড়ন ভালো। দেহের বাঁধন শক্ত। রঙ উজ্জ্বল। মুখ দেখে বয়স ধরবার জো নেই। ছবি খাঁও ধরতে পারলে না। বললে, 'তুমি পাশের গাঁয়ের বৌ? তা এ বনে কেন? চোখেই বা জল কেন তোমার?'

ছবি খাঁর কথায় রমণীর কান্না আরও বেড়ে গেলো। একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো সে। কান্নার বেগে কোন কথাই তার মুখে ফুটলো না।

ছবি খাঁ আবার ডাকলে। আবার বললে, 'কাঁদছো কেন? কি দুঃখ তোমার? আমি ছবি খাঁ। এ চাকলার মালিক। বলো, তোমার দুঃখের কথা বলো। আমি তোমার সহায় হবো।'

'মুনিব ?' কান্নায় আবার কণ্ঠ রুদ্ধ হলো রমণীর।

ছবি খাঁ বললে, 'বলো, তোমার ভয় নেই।'

'আমার যে সব গেচে গো মুনিব। ডাকাতরা ঘর লুটেছে। আগুন দিয়েছে। আমার স্বামীকে খুন করেছে। নিজের ইজ্জৎ নিয়ে আমি বনে এসে লুকিয়েছি। কিন্তু এখানেই বা কি করবো ? ক'দিন বাঁচবো। তাই ভাবছিলাম কি—'

'ভাবছিলে ?' রমণীর চোখে চোখ রেখে বললে ছবি খাঁ।

'হ্যাঁ, ভাবছিলাম। আত্মহত্যার কথা 'ভাবছিলাম মুনিব।'

'আত্মহত্যা!'

'তা ছাড়া আর পথ কি ? দুনিয়ায় কে আছে আমার ? কে আমায় আশ্রয় দেবে ?'

বলতে বলতে আবার জলের ঢল নামলো রমণীর চোখে। জলের তলায় লাল ডুগডুগ দু'খানি কপোল যেন জ্বলে উঠলো। ছবি খাঁ বললে, 'আছে। তোমার আশ্রয় আছে। আমার ঘরে। আমার অন্তরে। তাই তো খোদা আজ আমায় এখানে এনেছেন। তুমি 'না' বলো না। তুমি আমার ঘরে চলো।'

রমণী ভাবছিল। মাথাটা নীচু ক'রে আঁচলটা একটু নাড়তে নাড়তে ভাবছিল।

ছবি খাঁ তার হাত ধরলে। আবার বললে, 'তুমি 'না' করো না। আমার সঙ্গে চলো।'

সত্যি না করলে না রমণী। ছবি খাঁর চোখে একবার চোখ মেলালে। একবারই। তার পর বললে, 'বেশ, চলো। তুমি যদি চাও আমার তাতে আপত্তি কি ? আত্মহত্যায় কাজ নেই। আত্মহত্যায় পাপ লেখে। তোমার কথায় আমি রাজী।'

ছবি খাঁ রমণীকে নিয়ে বাড়ি ফিরলে। বিয়ে করলে।

কিছুদিন কাটলো। ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির রঙ বদলালো।

মেঘনা নদী, ইল্‌সা নদী একবার শুকালো। একবার ভরলো। নব-দম্পতীর দিন ভালোই কাটছে।

কিন্তু একদিন—

একদিন ছবি খাঁর পায়ের তলায় বিশেষ একটি চিহ্ন দেখে কেমন যেন উন্মনা হয়ে উঠলো রমণী। তার নীল নীল দু'টি চোখে কেমন যেন ভয়ের রেখা ফুটলো। বিবর্ণ বিষণ্ণ মুখে সে ছবি খাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করলে। ছবি খাঁ বললে, 'কেন? আজ হঠাৎ পরিচয়ের কথা কেন? আমাকে কি সন্দেহ হয় তোমার? আমি কি তোমার—'

বাধা দিলে রমণী: 'না। না। সে কথা নয়। তুমি বলো। তুমি বলো। তোমার কথা আমি জানতে চাই। শুনতে চাই। আমি আর বলতে পারছিনে। বলো। ওগো বলো।'

আজ সত্যি বললে ছবি খাঁ। একটু ঢাকলে না। একটু লুকলো না। সব কথা একটু একটু ক'রে খুলে বললে। বললে, যেমনটি সে তার পালক-পিতার কাছ থেকে শুনেছিল। তার আসল বাড়ি এটা নয়। এখানকার-সে-পালিত-পুত্র। কবে কোন্ কালে ছেলে ধরারা তাকে চুরি ক'রে এনে এখানে বিক্রি করেছিল। আজ পর্যন্তও সে তার জনক-জননীর পরিচয় উদ্ধার করতে পারে নি। কোনদিন পারবে কিনা সে তাও জানে না।

শুনতে শুনতে যেন বিকল হয়ে এলো রমণী। কয়েকবার কপালে করাঘাত ক'রে হঠাৎ যেন অজ্ঞান হয়ে পড়লো সে।

ছবি খাঁ প্রায় চীৎকার ক'রে বললে, 'ওগো, শুনছো। এমন হলে কেন? হঠাৎ কি হলো তোমার?'

কথা নেই, জ্ঞান নেই রমণীর।

দাসী এলো। বাঁদী এলো। ঘড়ায় ঘড়ায় জল ঢাললো মাথায়। অনেক—অনেকক্ষণ পরে রমণী চোখ মেলে চাইলো। ছবি খাঁ বললে, 'কি হলো? এমন করছো কেন?'

আবার কপালে করাঘাত করলে রমণী। উচ্ছ্বসিত অশ্রুর বান ডাকলো চোখে। মাথাটা কয়েকবার মাটিতে ঠুকে, বুকটা কয়েকবার হাত দিয়ে চাপড়িয়ে প্রায় চীৎকার ক'রে উঠলো, 'ওরে, যে মার কোল শূন্য ক'রে ছেলেধরারা একদিন তোকে কেড়ে এনেছিল, আমিই তোর সেই হতভাগিনী জননী। আমি—আমিই সেই পাপীয়সী।'

বলতে বলতে আবার অজ্ঞান হয়ে পড়লো রমণী। ছবি খাঁর পায়ের তলার মাটি যেন কাঁপছে।

সত্যি কাঁপছে। পা কাঁপছে। বুক কাঁপছে। দেহের শিরা-উপশিরাগুলো যেন টনটন ক'রে মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠছে।

গাঁয়ে ছিল এক ফকির। বাড়ি ছেড়ে ছবি খাঁ সেই ফকিরের কাছে আত্মসমর্পণ করলো।

ফকির বললে, 'যদিও না জেনে তুমি এ পাপে লিপ্ত হয়েছো তবুও তো এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই বাবা। তবে এক কাজ করো। আল্লার নাম করো। দান-দাতব্যি করো। তাহলে যদি কিছু পাপ লাঘব হয়।'

তাই করলো ছবি খাঁ। ফকির সাহেবের কথাই শুনলো। দীন-দুঃখীদের দু'হাতে অর্থ বিলোলো। তার টাকায় জলাশয় হলো। ধর্ম-মন্দির হলো। হলো পান্থনিবাস আর পথ-ঘাট। তার পর সব দিয়ে, সব বিলিয়ে—এক বস্ত্রে ফকির হয়ে, একদিন মক্কার পথ ধরলে সে।

সেই ছবি খাঁ। সেই ছবি খাঁর জাঙ্গাল।

পথ দিয়ে যেতে যেতে পথচারীরা বলে। ছবি খাঁর নাম বলে। ছবি খাঁর করুণ জীবন-কাহিনীও বলাবলি করে। কতো কাল হলো। কতো পরিবর্তন হলো। কিন্তু ছবি খাঁর কথা কেউ ভুলতে পারলো না। হয়তো কোনদিন ভুলতে পারবে না।

প তি ঘা তি নী স তী



লালবাঈ, লালবাঈ।

ভোরবেলার ধূ প - ছা য়া অন্ধকারে মহারানী দেখলেন লালবাঈকে।

পাশের মহলের বারান্দায় দাঁড়িয়েছে লালবাঈ। ঘন কৃষ্ণ ঘাগরা পরনে। মাথায় ছড়ানো আসমানী রঙের ওড়না। সোনার কাজ করা। সেই ঝিকমিকে ওড়নার আড়ালে লালবাঈ-এর চম্পাবরণ মুখ জ্বলছে, নক্ষত্র-জ্বলা নীলাকাশে পূর্ণিমা চাঁদের মতো।

মহারানী দেখলেন আর চোখ বুজলেন। মাথাটা তাঁর যেন ঘুরে গেলো। গা'টা কেমন যেন কাঁটা দিয়ে উঠলো। তিনি দাঁড়ালেন না। ভেতরে চলে গেলেন। বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কাঁদলেন। ফুলে ফুলে কাঁদলেন। কেঁদে বুঝি হালকা হতে চাইলেন।

কিন্তু না। মনের ভার তবু কাটলো না। বেদনার দাহ তবু কমলো না। বরং তা বাড়লো। শতশিখায় জ্বলে উঠলো। আগুনে আহুতি পড়লে আগুন যেমন ক'রে বাড়ে, চোখের জলে মহারানীর জ্বালাও তেমনি ক'রে বেড়ে গেলো।

কাল সারা রাতও ঠিক অমনি হয়েছে। কালই মহারাজ বরদা থেকে ফিরেছেন। যুদ্ধে জয়ী হয়ে এসেছেন। সারা বিষ্ণুপুরে আনন্দ। বিজয় উৎসব। সেই উৎসবের রোশনাই ছিল মহারানীর মনেও। তিনিও প্রতীক্ষা করেছিলেন। মহারাজ তাঁর ঘরেই আসবেন। নাম ধরে ডাকবেন। পালঙ্কের শ্বেত সমুদ্দুরে গা এলিয়ে দিয়ে

ধীরে ধীরে শোনাবেন তাঁর বিজয় কাহিনী। তিনি শুনবেন। শুনতে শুনতে তিনিও এলিয়ে পড়বেন। মিশে যাবেন শ্বেত সমুদ্দুরে।

চোখে চোখ রেখে বলবেন, 'আজ তুমি জয়ী।—দেশে দেশে তোমার নাম। মুখে মুখে তোমার কথা। তোমার যশ। ওঃ—তুমি কতো বড়ো। তুমি—'

'না।' বাধা দেবেন মহারাজ। বাধা দিয়ে বলবেন, 'বড় আমি বাইরে। অন্যের কাছে। তোমার কাছে আমি, আমি। একটু বড় নয়। একটু ছোট নয়। তোমার হৃদয়ের সরোবর যতটুকু, আমি ঠিক ততটুকুই। ততটুকুই।'

শুনতে শুনতে মহারানীর বুক ফুলে উঠবে। দু'টি চোখ বুজে আসবে। দু'ফালি ঠোঁটে লাগবে স্পন্দন।...

কিন্তু রাত বাড়লো। আলো নিবলো। থেমে গেলো উৎসবের বাঁশি। মহারাজ এলেন না। একটা খবর পর্যন্ত পাঠালেন না।

মহারানী এ ঘর করলেন। ও ঘর করলেন। একবার নিজেই গিয়ে বারান্দায় দাঁড়ালেন।

না। মহারাজ এলেন না। কোথাও তাঁর ছায়াটি পর্যন্ত মিললো না।

মহারানীর বুকটা কেঁপে উঠলো। যেন ভূকম্পন। তাড়াতাড়ি তিনি দাসীকে ডাকলেন। মন্ত্রীকে ডাকালেন। মন্ত্রী গোপাল সিংহ এলেন। এসে মাথাটা নীচু ক'রে রইলেন।

রানী বললেন, 'মন্ত্রী।'

'মা।'

'মহারাজ কোথায়? মহারাজ!'

মন্ত্রীর মুখে কথা নেই। মাথা নীচু। নির্বাক।

মন্ত্রীর অবস্থা দেখে মহারানীর দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে গেলো। চোখে তাঁর শকুনের পাখার মতো একটা কালো ছায়া ঘনালো।

বললেন, 'মন্ত্রীবর, চুপ ক'রে রইলেন কেন? বলুন কি হয়েছে? মহারাজ কোথায়?'

মন্ত্রী এবার মুখ খুললেন। বললেন, 'তুমি মা। কোন্ মুখে আর তোমায় সে কথা বলি।'

চমকে উঠলেন মহারানী। লাল টুকটুক ছু'খানি কপোল থেকে তাঁর কে যেন সবটুকু রক্ত চুমুক দিয়ে উঠিয়ে নিলে। মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে এলো। ছু'টি চোখও যেন বিবর্ণ হলো। বাইরের উৎসব-আলোর মতো তাঁর চোখের দীপ্তিও যেন নিবে গেলো।

বললেন, 'তবে—তবে কি মহারাজ—'

'মহারাজ ডুবেছেন মা। এক নাচওয়ালীর ছলনায় ভুলেছেন।'

'নাচওয়ালী? কে? কে সে?'

'বরদার বকশিশ। মুসলমানী। লালবাঈ।'

'লালবাঈ।' একবার নামটা উচ্চারণ ক'রেই হঠাৎ যেন থেমে গেলেন মহারানী। একটু আগেই যে চোখ বেতফুলের মতো নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছিল সে ছু'টি চোখ আবার যেন জ্বলে উঠলো। একটু থামলেন। একবার ভাবলেন। তার পর মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, আজ আপনি আসুন। আমায় একটু একলা থাকতে দিন। একলা থাকতে দিন।'

মন্ত্রী কি যেন বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মহারানীর ছু'টি চোখের দিকে তাকিয়ে আর বলতে পারলেন না। যেমন এসেছিলেন তেমন মাথা নীচু ক'রেই চলে গেলেন। কেবল তাঁর একটা দীর্ঘশ্বাস জানালার শার্সিতে শার্সিতে বাড়ি খেয়ে বাইরে উড়ে গেলো।

রাত বাড়লো। কৃষ্ণাতিথির রাত। অন্ধকার।

দাসীরা এলো। রূপোর থালায় খাবার সাজিয়ে নিয়ে। মহারানী উঠলেন না। কথা কইলেন না কারো সঙ্গে। পালঙ্কের শুভ্র শয্যায়

এক মুঠো ঝরা গোলাপের মতো পড়ে রইলেন মহারানী। যারা এসেছিল তারা চলে গেলো।

ও মহলে তখন উৎসব। সুর উঠেছে। ঘুঙুর বাজছে। নাচ-গান চলেছে। এ মহল থেকে সবই শোনা যায়। সবই বোঝা যায়।

নাচছে—নাচছে বুঝি লালবাঈ।

মহারাজের ক্ষুধিত দৃষ্টির সামনে যাদুকরী নাচছে। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ মাটিতে না পড়ে যেন মহারানীর বুকে এসে পড়ছে।

কি একটা তীব্র ব্যথায় বুকটাকে একবার চেপে ধরলেন মহারানী। কয়েকবার এপাশ-ওপাশ করলেন। তার পর একবার উঠে ওপাশের জানালাটাকে বন্ধ ক'রে দিলেন। আলো দিলেন নিবিয়ে। ঘর অন্ধকার। সেই অন্ধকারে নিজেকে মিলিয়ে দিতে চাইলেন মহারানী। নিজেকে ভুলে যেতে চাইলেন। কিন্তু না। পারলেন না। ভুলতে গিয়ে বিপদ বরং বাড়লো। যে সুর এতক্ষণ কানে বাজছিল, এবারে যেন তা রক্তে বেজে উঠলো।

লালবাঈ! লালবাঈ! লালবাঈ-এর কাছে তাঁর হার হয়েছে। তাঁর মান, তাঁর নারীত্ব সব কিছুই পরাজয় মেনেছে। আজ নিজেকে বড় অসহায় মনে হলো মহারানীর। বড় দীন, বড় রিক্ত। এই রিক্ততার বেদনা বইতে না পেরে এক সময় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন তিনি।

মল্লভূমের রাজা তখন দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ। এই রঘুনাথের আমলেই বরদায় বিদ্রোহ হলো। বিদ্রোহের নায়ক শোভা সিংহ।

রঘুনাথ ছুটলেন বিদ্রোহ দমন করতে।

শোভা সিংহ হার মানলো। সারা বরদা রঘুনাথের কাছে মাথা নোয়ালো। অনেক ধন-রত্ন নিয়ে রাজধানীতে ফিরলেন রঘুনাথ। সঙ্গে আনলেন আরও এক রত্ন। রঘুনাথের কথায় নারী-রত্ন।

লালবাঈ। নাচওয়ালী লালবাঈ। সুন্দরী। মুসলমান যুবতী। রঘুনাথ তার রূপে মজলেন।

'বিবি, আমার লালবিবি।' রঘুনাথ ডাকেন।

লালবাঈ আসে। হাসে। সুর্মা-টানা একজোড়া বড় বড় চোখ তুলে ধরে রঘুনাথের চোখের উপর। বলে, 'আমায়—আমায় ডাকছেন—জাহাঁপনা!'

'হ্যাঁ, এসো। কাছে বসো। আচ্ছা, তুমি অতো দূরে দূরে থাকো কেন বলো তো?'

রঘুনাথের কথায় আবার হাসলে লালবাঈ। গোলাপ পাপড়ি গালের সঙ্গে তার টানা টানা দু'টি চোখও যেন হেসে উঠলো। গ্রীবা দুলিয়ে প্রথমটায় সে একটু দূরে সরলে। বাঁকা চোখে একবার রঘুনাথের দিকে চাইলে। তার পর ঘাগরা ফুলিয়ে আবার রঘুনাথের কাছে এসে বসলো।

রঘুনাথ বললে, 'কই, আমার কথার উত্তর দিলে না তো?'

'কি উত্তর দেবো জাহাঁপনা?'

'যা তোমার মন চায়।'

'আমার মন?'

বলতে বলতে একবার থামলে লালবাঈ। একটু যেন ভাবলে। ভেবে বললে, 'জাহাঁপনা অতো জানেন, তবু একটা সোজা কথা জানেন না? রমণীর মন পেতে হলে মন দিতে হয়। মন না দিলে মন পাওয়া যায় না।'

'আমি মন দিই নি? কি বলছো তুমি? আমি মন দিই নি?'

লালবাঈ খিলখিল ক'রে হেসে উঠে রঘুনাথের সব কথাকে ডুবিয়ে দিলে।

লালবাঈ-এর জন্যে নতুন মহল হলো। লাল মহল।

রঘুনাথ নতুন দীঘি কাটালেন। লাল বাঁধ। মন না দিলে

রমণীর মন পাওয়া যায় না। লালবাঈ-এর মন চাই। রঘুনাথ তাই মন দেবেন। সব দেবেন। যদি লালবাঈ খুশী হয়।

সেদিন পূর্ণিমা। আলো ঝলমল বিষ্ণুপুর। মদনমোহনের মন্দিরে উৎসব।

লালবাঈ আজ সাজলে না।

দাসীরা চুল বাঁধতে এসে চলে গেলো। ফুলওয়ালী ফুল নিয়ে ফিরে গেলো।

খবর পেলেন রঘুনাথ। ছুটে এলেন লাল মহলে।

ডাকলেন, 'বিবি—আমার লালবিবি।'

লালবাঈ উঠলে না। কথার জবাবও দিলে না। মুখ কালো ক'রে পালঙ্কে পড়ে রইলো।

রঘুনাথের চোখের আলো যেন নিবে গেলো। লালবাঈ-এর কাছে গেলেন রঘুনাথ। পাশে বসলেন। মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'লালবিবি, ওঠো। কি হয়েছে তোমার? লালবিবি—'

লালবাঈ নড়লো না। কথা কইলো না। তার ডাগর ডাগর দু'টি চোখের কোল বেয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। চমকে উঠলেন রঘুনাথ।

কাঁদছে। লালবিবি কাঁদছে।

কি যেন হলো রঘুনাথের। লালবাঈকে তিনি টেনে তুললেন। চোখের জল মোছালেন। বললেন, 'কাঁদছো? কাঁদছো তুমি লাল?'

'হ্যাঁ, কাঁদছি জাহাঁপনা।'

'কেন? কাঁদছো কেন লাল? কি দুঃখ তোমার? তোমার কিসের অভাব?'

'অভাব!'

একটু হাসলে লালবাঈ। হাসি-অশ্রুর রামধনু ফুটলো মুখে। বললে, 'জাহাঁপনা, আমার মনে হয় আপনাকে পেয়েও যেন পেলাম না। আমাতে আপনাতে অনেক ব্যবধান।'

'কেন, তোমার মুখে আজ এ কথা কেন লাল ?'

'আপনি হিন্দু আমি মুসলমান।'

'ওঃ, তাতে হয়েছে কি ?'

'ধর্ম এক না হলে মন এক হয় না জাহাঁপনা। দেহ মিললেও মন মেলে না। কিন্তু—'

'বলো। থামলে কেন ?'

'আমি যে আপনাতে মিলতে চাই। প্রাণে প্রাণ মেশাতে চাই।'

বলতে বলতে লালবাঈ থামলে। জল ছলছল চোখের দৃষ্টি একবার রঘুনাথের মুখের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনলে। তার পর হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, 'এক সঙ্গে দু'কূল রাখা যায় না জাহাঁপনা। একটাকে আপনার ছাড়তে হবে। হয় আমাকে, না হয় আপনার ধর্মকে। বলুন, কাকে ছেড়ে কাকে রাখবেন। আমাকে, না আপনার ধর্মকে ?'

রঘুনাথ লালবাঈ-এর একটা হাত টেনে হাতের মুঠোতে নিলেন। তাতে আস্তে আস্তে চাপ দিতে দিতে বললেন, 'তোমাকে—তোমাকে !'

কথাটা কানে গেলো মহারানীর। শুনে তিনি চমকে উঠলেন। জ্বলে উঠলেন।

মন্ত্রী গোপাল সিংহ কেঁদে বললেন, 'এবারে কি করি মা, একটা মুসলমানীর জন্যে জাতি-কুল সবই যে রসাতলে যায়।'

মহারানী কথা কইলেন না।

মন্ত্রী কেঁদে বললেন, 'মা, 'ভোজনতলা' ঠিক হয়েছে। ওখানেই ভোজ হবে। নিষিদ্ধ মাংস দেওয়া হবে তাতে। ওখানেই মহারাজ রাজ্যের প্রজাদের নিয়ে—'

হঠাৎ বাজ পড়ার মতো ফেটে পড়লেন মহারানী, 'না না। তা হবে না। তা হবে না। আমি তাতে বাধা দেবো। প্রয়োজনে মহারাজকে আমি হত্যা করবো।'

'হত্যা ? সে কি কথা মা ?'

'হ্যাঁ, মন্ত্রী। একজনকে সরিয়ে দিলে যদি সমস্ত প্রজার কল্যাণ হয়, ধর্ম রক্ষা হয়, তবে আমি তাই করবো। তবে আমি তাই করবো।'

বলতে বলতে মহারানী হঠাৎ যেন বসে পড়লেন।

আবার সন্ধ্যা। আবার চাঁদ। আবার হাসি। আবার গান। লালবাঈ-এর চোখে আবার সে দীপ্তি। রঘুনাথের চোখে আবার সেই নেশা।

ভারি সুন্দর হয়ে সেজেছে লালবাঈ। গলায় মালা, মাথায় চূড়া, হাতে বালা। সবই ফুলের। ফুল-সাজে যেন ফুলরানী। লালবাঈ সত্যি যাদুকরী।

হঠাৎ বাইরে কলরব। জনতার চীৎকার।

কি ? ব্যাপারখানা কি ?

রঘুনাথ তাড়াতাড়ি বাইরে গেলেন। বাইরে সশস্ত্র লোক। উত্তেজিত জনতা। তাদের পরিচালনা করছেন স্বয়ং মহারানী।

রঘুনাথ বললেন, 'মহারানী তুমি ?'

মহারানী রঘুনাথের দিক্ থেকে মুখটাকে ঘুরিয়ে নিলেন। বললেন, 'মহারানী নয়। সন্তানের মা, প্রজার মা, প্রজার দুঃখে নিজেই ঘর ছেড়ে এসেছি।'

'প্রজার দুঃখে ? তুই—তুই পাপীয়সী, তুই,—'

কথা শেষ হলো না রঘুনাথের! একটা তীর এসে তাঁর বুকে বিঁধলো। মাটিতে ঢলে পড়লেন রঘুনাথ। রক্ত পড়লো গড়িয়ে। যন্ত্রণায় ছটফট করছেন তিনি।

'বিবি—আমার লালবিবি, আমি চলেছি—পার তো পালাও। আত্মরক্ষা করো।'

পারলে না। লালবাঈও আত্মরক্ষা করতে পারলে না। গোপনে

সে পালিয়ে চলেছিল। পেছনের দরজা দিয়ে। জনতা তাকে চিনলে। ধরলে। তার পর তাকে ডুবিয়ে মারলে লাল বাঁধের জলে।

চিতা জ্বলছে সপ্তশিখায়। রঘুনাথের মৃতদেহ তাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। প্রজারা এসে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে চারপাশে।

আজ অনেকদিন পরে আবার সেজেছেন মহারানী। নতুন কাপড় পরেছেন। নতুন শাঁখা পরেছেন।

কপালে দিয়েছেন সিঁদুরের ফোঁটা। শুভ্র কপালে তা জ্বলজ্বল করছে।

আপন মনে স্বামীর চিতাকে কয়েকবার প্রদক্ষিণ করলেন মহারানী। দু' হাত মাথায় ঠেকিয়ে কার উদ্দেশে যেন প্রণাম করলেন কয়েকবার। তার পর এক সময় নিজেও সেই জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করলেন।

প্রজারা কেঁদে উঠলো, 'মাগো, রানী মা, এ কি করলে মা।'

চিতার আগুন ততক্ষণে মহারানীকে সম্পূর্ণভাবেই গ্রাস ক'রে ফেলেছে।

অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ



শেষ পর্যন্ত গিন্নী মারা গেলো। গোবিন্দ ঘোষ চোখে অন্ধকার দেখলে। রূপ-রস-গন্ধে-ভরা যে জগৎ তাকে টেনে রেখেছিল অ্যাদ্দিন, একটি মৃত্যু তাতে ছেদ টানলো।

প্রতিবেশীরা, শুভাকাঙ্ক্ষীরা বললে, 'বয়স আর তোর তেমন কি হলো গোবিন, এবার বে-থা কর্। কাজ-কম্মে মন দে।'

বে-থা! কাজ-কম্ম! কথা দু'টি ভাবতে ভাবতে একবার মনে মনে হাসলে গোবিন্দ ঘোষ। বুক থেকে তার একটি উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস উড়ে গেলো। দু'টি চোখের কোল একবার যেন টলটল ক'রে উঠলো।

বললে, 'ওতে আর মন নেই ভাই। কি হবে আর বে-থা ক'রে? পরকালের কাজ হবে? তার চেয়ে আশীর্বাদ করো যেন কৃষ্ণপদে মতি হয়।'

বলতে বলতে কয়েক ফোঁটা জল গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়লো গোবিন্দ ঘোষের। কি যেন একটা আবেগে চোখের দু' জোড়া পাতা এক করলে গোবিন্দ ঘোষ। শুভাকাঙ্ক্ষীরা আশা ছাড়লে। পথ ছাড়লে। এক তারা-ঝিকমিক-করা রাতে ঘর ছাড়লে গোবিন্দ ঘোষ। সবার অজান্তে। যাবার বেলা শুধু একবার মনটা কেমন যেন টনটন ক'রে উঠেছিল। দু'টি চোখ কেন যেন ছলছল ক'রে উঠেছিল।

ঐ পর্যন্তই। তাতে মতের পরিবর্তন হলো না গোবিন্দ ঘোষের।

সে পথ বদলালো না। রুক্ষ-বন্ধুর পথ ভেঙে ধান ঝনঝন মাঠ ভেঙে সে পুণ্যতীর্থ অগ্রদ্বীপে এসে বাসা বাঁধলো।

বাস বলেই বাসা, নইলে বাসার আর কোন মাহাত্ম্য নেই। শনে ছাওয়া একখানি ঘরে বাস করে গোবিন্দ ঘোষ। জানালা দরজা তেমন একটা কিছু নেই। একেবারে সাদাসিদে। ঘরের পেছনে যে আম গাছটা বয়সের ভারে নুয়ে পড়ে খড়ের চাল ছুঁই ছুঁই করছে, সেই গাছেই উড়ে আসে নানান রকম পাখি।

গোবিন্দ ঘোষ তার সবগুলির নামও জানে না। তারাই যেন গোবিন্দ ঘোষের একমাত্র সঙ্গী। তাছাড়া কাছে-পিঠে মানুষজন বড় একটা কেউ নেই। তাদের গানেই ঘুম ভাঙে গোবিন্দ ঘোষের। রাধা-কৃষ্ণের স্তুতি গায়। তার পর পূব আকাশটা লাল লাল হতেই সে গঙ্গা স্নানে যায়।

একদিন গঙ্গা স্নানে গিয়ে চোখ জুড়িয়ে গেলো গোবিন্দ ঘোষের। প্রভাতসূর্যের রক্ত-আভা পড়েছে গঙ্গায়। ঝিরঝিরে দখনে বাতাস বইছে। ভক্ত পরিবৃত হয়ে চৈতন্যদেব গঙ্গা স্নানে এসেছেন। সেই সুন্দর কান্তি। সেই ভাবময় রূপ। কীর্তনমাধুরীর ছন্দে স্পন্দিত হৃদয়। শ্রীচৈতন্য। চৈতন্যময় পুরুষ

মুগ্ধ হলো গোবিন্দ ঘোষ। এগিয়ে গেলো কাছে। ডাকলে, 'প্রভো!'

চৈতন্যদেব ফিরে তাকালেন। ঘুরে দাঁড়ালেন।

মনোহর চোখের দু'টি দৃষ্টি বিছিয়ে দিলেন গোবিন্দ ঘোষের দিকে। হাসি মাখা মুখে বললেন, 'কে?'

'আমি অভাজন, প্রভুর কিংকর।'

চৈতন্যদেবের মুখের হাসি যেন নিবে গেলো। দু'টি চোখ ব্যথা ছলছল। বললেন, 'ছিঃ, ও কথা বলতে নেই। মানুষ আবার

মানুষের কিংকর কি গো? আমরা সবাই শ্রীগোবিন্দের দাস—দাসানুদাস।'

ভোরের লাল সূর্য তখন সোনার রঙ ধরেছে। সোনা রোদ্দুরে ছড়িয়ে গেছে গাছ-গাছালির মাথায় মাথায়—পাতায় পাতায়। শিশিরের মুক্তো-পরা বৃক্ষচূড়া—ঝিলমিল করছে। ঝিকমিক করছে। শান্ত স্নিগ্ধ গঙ্গা বয়ে চলেছে ধীরে ধীরে। লোক জমছে—লোক বাড়ছে ঘাটে ঘাটে। কীর্তনের মিঠে সুরে মলয় বাতাস মুখর।

গোবিন্দ ঘোষ আবার তাকালে শ্রীচৈতন্যের মুখের দিকে। সেই দিব্য কান্তি। সেই মোহন রূপ। সেই স্নেহ-স্নিগ্ধ গভীর দু'টি চোখ। মানবে কি এতো রূপ সম্ভব? না, না। এ প্রভুর ছলনা। এ পরীক্ষা। দীক্ষার শেষে শিক্ষা নয়। দীক্ষার আগে শিক্ষা।

ভাবতে ভাবতে জল নামলো গোবিন্দ ঘোষের চোখে। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়লো। সোনালী রোদে চিকমিক ক'রে উঠলো।

শ্রীচৈতন্য বললেন, 'কাঁদছো? চোখে জল কেন?'

গোবিন্দ ঘোষ আর দাঁড়াতে পারলে না। কাঁদতে কাঁদতে শ্রীচৈতন্যের চরণতলে লুটিয়ে পড়লো। বললে, 'প্রভো! আর পরীক্ষা কেন? আমি ধন চাইনে—মান চাইনে। আত্মীয়স্বজন—বন্ধুবান্ধব কিছু চাইনে। শুধু তোমার শ্রীচরণ আমি পূজো করতে চাই। আমায় অনধিকারী ক'রো না। আমায় ছলনা ক'রো না।'

আবার হাসি শ্রীচৈতন্যের। ভক্তের ভক্তিতে খুশী শ্রীচৈতন্য।

গোবিন্দ ঘোষকে ধুলা থেকে তুললেন। তিনি আলিঙ্গন করলেন। বললেন, 'গোবিন্দ। সত্যি তুমি গোবিন্দ-ভক্ত। বৈষ্ণব-অনুরক্ত। কিন্তু- '

'কিন্তু! কিন্তু কি প্রভো!' ঝড়ে ভীত পক্ষীশাবকের মতো থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো গোবিন্দ ঘোষের বুক। সর্ব অঙ্গে স্বেদ-শিহরন।

চৈতন্যদেব বললেন, 'না থাক। সে কথা আর একদিন হবে। আপাতত তুমি আমার সঙ্গে থেকো। যদ্দিন নিষ্কাম কর্ম করবে তদ্দিন এ অধিকার তুমি হারাবে না।'

গোবিন্দ ঘোষ মাথা নীচু ক'রে রইলো। চোখের কোল বেয়ে তখনও তার জল ঝরছে। এবারে ব্যথার জল নয় আনন্দাশ্রু। গোবিন্দের ভাগ্যে ভক্তমন আন্দোলিত।

দিন যায়। মাস যায়।

গোবিন্দ ঘোষ প্রভুর পাশে পাশে থাকে। নামগানে ডুবে থাকে।

প্রভু ডাকেন, 'গোবিন্দ!'

ছায়ার মতোই থমকে দাঁড়ায় গোবিন্দ ঘোষ। বলে, 'প্রভো!'

'তুমি পরম বৈষ্ণব গোবিন্দ!'

গোবিন্দ ঘোষের মাথাটা নুয়ে আসে আপনা থেকেই। ঘন কৃষ্ণ দু'টি চোখের তারায় খুশীর ছাপ। হাতের চেটো দু'টি বাজাতে বাজাতে বলে, 'সবই প্রভুর ইচ্ছে। তিনি যন্ত্রী আমি যন্ত্র। তিনি বাজান, আমি বাজি।'

গোবিন্দর কথায় শ্রীচৈতন্যের কপোল দু'টিতে হাসির রঙ লাগে। চোখ দু'টি জ্বলে ওঠে আশ্চর্য দীপ্তি নিয়ে। গোবিন্দকে কাছে টেনে কীর্তনের রসে আরও গভীরভাবে মজে যান তিনি।

একদিন।

একদিন আহারের পর বিশ্রাম করছেন শ্রীচৈতন্য। পাশে বসে গোবিন্দ ঘোষও বিশ্রাম করছে। আকাশে জ্বলছে দুপুর বেলার সূর্য। আগুনের ফুলকি যেন ছিটকে পড়ছে মাটিতে। দক্ষিণ দিক্‌কার অশ্বত্থ গাছটার ডাল কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে, পাতা নাচিয়ে নাচিয়ে উড়ে আসছে দখনে হাওয়া। মিষ্টি।

হঠাৎ যেন কি খেয়াল হলো শ্রীচৈতন্যের। রহস্যভরা দৃষ্টিতে

একবার গোবিন্দ ঘোষের দিকে তাকালেন তিনি। ডাকলেন, 'গোবিন্দ!'

গোবিন্দ ঘোষের চোখ দু'টি ঘুমের ঘোরে জড়িয়ে এসেছিল। প্রভুর ডাকে চমকে উঠলো সে। বললে, 'প্রভো!'

'আজ যে আমার মুখশুদ্ধি হলো না গোবিন্দ।'

'মুখশুদ্ধি হলো না? সে কি কথা প্রভু।' বলতে বলতে গোবিন্দ ঘোষ উঠলো। ঘরে ঝুলনো ঝুলিতে হরীতকী রয়েছে। তাড়াতাড়ি তাই নিয়ে এলো।

শ্রীচৈতন্য একটু হাসলেন। গোবিন্দর হাত থেকে হরীতকী নিয়ে বললেন, 'গোবিন্দ। তোমার ভক্তির সামগ্রী আমি আহ্লাদের সঙ্গে গ্রহণ করলাম। কিন্তু—'

'কিন্তু!'

আবার চমকে উঠলো গোবিন্দ ঘোষ। প্রভুর মুখমণ্ডল হঠাৎ অমন গম্ভীর হয়ে গেলো কেন? হাসি হঠাৎ নিবে গেলো কেন? একটা বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সে।

শ্রীচৈতন্য বললেন, 'তোমাকে আর আমার কাছে রাখতে পারবো না গোবিন্দ। তুমি ঘরে ফিরে যাও।'

আকাশ যেন ভেঙে পড়লো গোবিন্দ ঘোষের মাথায়। কেঁদে কেঁদে বললে, 'কেন প্রভু? আমার উপর এ আদেশ কেন?'

চৈতন্যদেবের দু'টি চোখও যেন ব্যথায় ছলছল ক'রে উঠলো। বললেন, 'গোবিন্দ। তুমি যথার্থ ভক্ত। হরি পূজার অধিকারী। কিন্তু নিষ্কাম ব্রত পালনে উপযুক্ত নও। এখনও তোমার বিষয়-বাসনা দূর হয় নি। তুমি গৃহে যাও। হরি আরাধনা করো। তাতেই তুমি মুক্তি পাবে।

বলতে বলতে চৈতন্যদেব গোবিন্দ ঘোষের মাথায় একবার হাত বুলিয়ে দিলেন।

গোবিন্দ ঘোষও স্থির থাকতে পারলে না। এবারে প্রভুর

চরণতলে লুটিয়ে পড়লো সে। বললে, 'প্রভো! সকলই তো আমি জলাঞ্জলি দিয়েছি। আমি কিছুই চাইনে। আমি কিছুই চাইনে। আমি আর সংসারে ফিরবো না।'

গোবিন্দ ঘোষকে মাটি থেকে তুললেন শ্রীচৈতন্য। বুকে নিলেন। কোল দিলেন। তার পর বললেন, 'তুমি অনেক ছেড়েছো কিন্তু সব ছাড়তে পারো নি। বিষয় কণ্টক এখনও তোমার হৃদয়ে গাঁথা। তুমি সঞ্চয়বাদী। তাই তো সামান্য হরীতকীটুকু তুমি সঞ্চয় ক'রে রেখেছো। যা বৈষ্ণবের ধর্ম-বিরুদ্ধ। তুমি গৃহে ফিরে যাও। যদি কখনও কোন অলৌকিক বস্তু পাও, তবে তা সযত্নে রেখে দিয়ো। একদিন গোবিন্দ তোমায় কৃপা করবেন। তোমার আশা পূর্ণ হবে।'

বলে শ্রীচৈতন্য গোবিন্দর কাছ থেকে দূরে চলে গেলেন।

গোবিন্দ ঘোষ প্রথমটায় দাঁড়িয়ে রইলো। চোখের উপর কি ঘটে গেলো সহসা যেন তা বুঝে উঠতে পারলে না। কেবল তার দু'টি চোখ দিয়ে দরদর ক'রে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়লো। তার পর একসময় প্রভুর উদ্দেশে প্রণাম ক'রে অগ্রদ্বীপের পথে রওনা হলো। অস্তগামী সূর্য আজ যেন বড় করুণ চোখে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে।

আবার গঙ্গাতীরে এসে ঘর বাঁধলে গোবিন্দ ঘোষ।

গঙ্গা স্নানে আর নামগানে তার দিন কাটে। রাতেও বড় করুণ সুরে 'মাথুর' গায় গোবিন্দ ঘোষ। ভক্তজন আসে। গান শোনে। যাবার বেলা চোখে জল নিয়ে, 'গোবিন্দ গোবিন্দ' বলে ঘরে ফেরে সবাই।

গোবিন্দ ঘোষ বলে, 'প্রভু আমায় কৃপা করবেন না, হালদার মশাই?'

বুড়ো হালদার তার মালার থলিটি তিনবার কপালে ঠেকিয়ে বলে, 'হবে হবে। নিশ্চয়ই হবে। তোমার অভিলাষ পূর্ণ হবে।

তিনি প্রেমের ঠাকুর। কতো অনধিকারী তাঁর কৃপায় ধন্য হচ্ছে। আর তোমার মতো ভক্তের উপর প্রভু নির্দয় হবেন কেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনি ঠিক বলেছেন, হালদার মশাই। প্রভু আসবেন। নিশ্চয়ই আসবেন। আমি যে রোজ রাতে তাঁকে স্বপ্নে দেখি। সেই সুন্দর নয়নাভিরাম রূপ, সেই প্রশান্ত হাসি। আমায় কাঁদায় হালদার মশাই। প্রতি রাতে আমায় কাঁদিয়ে যায়।'

বলতে বলতে চোখের জলে বুক ভাসে গোবিন্দ ঘোষের। বুড়ো হালদার মনে মনে বলে, 'আহা এমন ভক্ত কোথাও দেখি নি গো। এ জনম আমার সার্থক হলো।'

বুড়ো হালদার চলে যায়।

সারা রাত আর চোখে ঘুম নামে না গোবিন্দ ঘোষের। উঠোনে বসে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে থাকে। রাতের গঙ্গা নিস্তব্ধ। কূলের সঙ্গে কথা কয়ে কয়ে শিরশির ক'রে বয়ে যায়। রাতের চাঁদ তার বুকের আয়নায় মুখ দেখে।

একটা শব্দ হতেই চমকে ওঠে গোবিন্দ ঘোষ। হকচকিয়ে ওঠে। সতৃষ্ণ নয়নে পথের দিকে চায়। প্রভু এলেন? আমার প্রেমের ঠাকুরের এ্যাদ্দিন পরে দয়া হলো?

না। তিনি নন। কেউ নয়। এক ঝলক হালকা হাওয়া পথের ঝরা পাতাগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে গেলো।

গোবিন্দ ঘোষের বুকটা দাপিয়ে ওঠে। একটা করুণ সুরে গান ধরে গোবিন্দ ঘোষ। নিজে কাঁদে। অন্যকে কাঁদায়।

একদিন গঙ্গায় নেমেছে গোবিন্দ ঘোষ। স্নান করছে। হঠাৎ কি যেন তার পিঠ ছুঁয়ে গেলো। 'গোবিন্দ গোবিন্দ!' বলে পিছু ফিরলো গোবিন্দ ঘোষ। দেখলে, একখণ্ড শবদাহের কাঠ।

গোবিন্দ ঘোষ কাঠখণ্ডকে তীরে তুলে রাখলে। মনটা কেন যেন উদাস হয়ে গেলো তার। শরীরটা কেমন যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। সেই অবস্থায়ই স্নান সেরে সে ঘরে চলে এলো।

ঘরে ফিরেও মনের অবস্থা ফিরলো না গোবিন্দ ঘোষের। সে আশ্চর্য ভাব কাটলো না। সারাদিন কে যেন তার মনকে উড়িয়ে উড়িয়ে নিয়ে চললো। রাতে স্বপ্ন দেখলে, নারায়ণ এসেছেন। বলছেন,—'গোবিন্দ, ভুলো না। গঙ্গায় আজ যে বস্তুটি তোমার হাতে এসেছিল, ও কাঠ নয়। একখণ্ড কালো পাথর। যাও, যাও, ওটি ঘরে নিয়ে এসো। মহাপ্রভু আসছেন। ওটি তাঁরই হাতে দেবে।'

চকিতে ঘুম ভেঙে গেলো গোবিন্দ ঘোষের। এ কি! এ কী দেখলে সে! তার ভাঙা ঘরে স্বয়ং নারায়ণ এসেছিলেন। স্বয়ং নারায়ণ। আহা কি ভাগ্য তার! কি সৌভাগ্য! 'নারায়ণ! নারায়ণ! গোবিন্দ! গোবিন্দ!' বলতে বলতে গোবিন্দ ঘোষ গঙ্গাতীরে ছুটলো।

ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। গাছ-গাছালি যেন অন্ধকারে মিশে আছে। বারে বারে পথে আটকে যায় গোবিন্দ ঘোষ। গন্ধরাজের ঝাড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। থামে না। সেইভাবেই গঙ্গাতীরে যায়। অন্ধকারে খুঁজে খুঁজে সেই প্রস্তরখণ্ড নিয়ে ঘরে ফেরে। এ্যাদ্দিন পরেও চৈতন্যদেবের কথাগুলো তার মনে পড়েছে।

পরদিন সকাল সকাল ভিক্ষায় বেরুলো গোবিন্দ ঘোষ। আজ তার প্রাণ নাচছে। কণ্ঠে আজ 'মাথুর' গান নয়। মিলনের গান। মিলনের সুরে তার দেহ-মন মেতে উঠেছে।

দুপুরে ঘরে ফিরেই দেখলে চৈতন্যদেব দুয়ারে দাঁড়িয়ে। দূর থেকেই লাফিয়ে উঠলো গোবিন্দ ঘোষ। 'প্রভো! প্রভো! আমার দয়াল ঠাকুর!' বলতে বলতে শ্রীচৈতন্যের চরণতলে লুটিয়ে পড়লো সে।

চৈতন্যদেব বললেন, 'গোবিন্দ মাটিতে নয়, আমার বুকে এসো।'

চৈতন্যদেব গোবিন্দকে বুকে টেনে নিলেন।

বললেন, 'কি পেয়েছো, দাও গোবিন্দ।'

'পেয়েছি, আমি পেয়েছি প্রভু। গঙ্গায় আমি অমূল্যধন কুড়িয়ে পেয়েছি। সেই ধনই তো আমার জীবন ধন—জীবন স্বামীকে এনে দিয়েছে। সে যে আমার পরম ধন প্রভু।'

গোবিন্দ ঘোষ ঘর থেকে সেই কৃষ্ণ প্রস্তরখণ্ড এনে মহাপ্রভুর হাতে দিলে।

শ্রীচৈতন্য প্রস্তর খণ্ডটিকে দেখলেন। বললেন, 'কাল এক মূর্তিকার আসবে। তার হাতে এই প্রস্তরখণ্ড দিয়ো। এই পাথর দিয়েই সে গোপীনাথ বিগ্রহ গড়ে দেবে। গোবিন্দ! তুমি ধন্য। তোমার উপর শ্রীহরির কৃপা হয়েছে।'

চৈতন্যদেব চলে গেলেন।

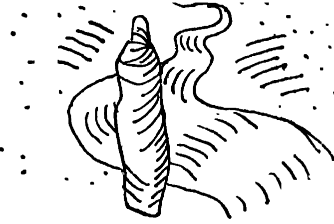
পরদিন সত্যি এক মূর্তিকার এলো। ঠুকঠুক ক'রে পাথর কেটে মূর্তি গড়লো। অপূর্ব—মনোহর মূর্তি।

গোবিন্দ ঘোষ বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। এই রূপই তো আমি স্বপ্নে দেখেছি। এ রূপই তো আমার মন ভুলিয়েছে। ওরে আয়, তোরা দেখে যা। আমার প্রভুর কালো বরণ একবার তোরা দেখে যা রে! প্রাণ ভরে দেখে যা।'

ভাবাবেগে গোবিন্দ ঘোষ নিজেই নৃত্য শুরু ক'রে দিলে।

অগ্রদ্বীপে গোপীনাথজীর প্রতিষ্ঠা হলো।

সতী বিবির খাল



সতী বিবি যে দেশের কন্যা, জানি না সে দেশ আজও তাঁকে মনে রেখেছে কিনা! মরুর রাজ্য আরব দেশের ছায়াস্নিগ্ধ কোন প্রান্তে রাতের চাঁদ যখন সোনা ছড়ায়, জানি না তখন সেখানকার কোন কুটির থেকে কোন দীর্ঘশ্বাস উড়ে এসে খেজুর ডালে কাঁপন তোলে কিনা। কিন্তু জানি, সতী বিবিকে বাঙলাদেশ মনে রেখেছে। ঘর ছেড়ে, সব ছেড়ে, যে বিদেশিনী এ দেশে এসে প্রাণ দিয়েছিলেন, বাঙলাদেশ তাঁকে ভোলে নি। কাউকে ভুলতেও দেয় নি।

পাবনা জেলার শাহ্‌জাদপুরের গা ছুঁয়ে গেছে হুরাসাগর নদী। এই হুরাসাগর থেকেই একটি খাল বেরিয়েছে। তার নাম সতী বিবির খাল। এ অঞ্চলের লোক এখনও সতী বিবির নামে মানত করে। পরবে-উৎসবে খালে এনে দুধ-চিনি দেয়। পয়সা ফেলে। এ পথে যেতে নেয়েরা খালের জলে 'নাও'এর গলুই ভিজিয়ে নেয়। ভক্তি-শ্রদ্ধায়। সতী বিবির নাম মন্ত্রের মতো গুনগুন ক'রে তাদের মনে বাজে।

সতী বিবিকে কে ভুলবে? আরব দেশে না হোক, সতী বিবি বাঙলার হৃদয়ে নিজের নাম খোদাই ক'রে গেছেন। সে-নাম কোন দিন ঘুচবে না। কোনকালে মুছবে না।

আরব দেশের রাজপুত্র। মখতুম শাহ্‌দৌলা। মনে তাঁর কি কথা বাজলো, কি রঙ ধরলো, রাজ্যে-ঐশ্বর্যে সুখ পেলেন না তিনি। বললেন, 'পথ আমায় টেনেছে, খোদাতালার ডাক আমি শুনেছি। মখতুম বেরিয়ে পড়ো। দেশে দেশে যাও। আমার নাম বিলাও।'

দিনে রাতে সেই এক চিন্তা মখতুম শাহের। তুপুরে আগুন-জ্বলা আকাশের নীচে মরুর বালু যখন ছুরির ফলার মতো ঝিকঝিক করে, তখন চুপচাপ ঘরের কোণে বসে থাকেন মখতুম শাহ্‌। কারো কাছে যান না। যেতে ভালো লাগে না। মনে তাঁর একই কথা। কানে তাঁর একই সংগীত, 'মখতুম বেরিয়ে পড়ো!'

দিন যায়। রাত আসে। রোদে-পোড়া মরুপ্রান্তর ধীরে ধীরে শীতল হয়। পথচারীরা পথে বেরোয়। মরুযাত্রীরা তাঁবু তোলে। পথ চলে।

তখন—তখন যেন কেমন হয়ে যান মখতুম শাহ্‌। বুকটা কেমন যেন তুপদাপ ক'রে ওঠে। চোখ তুটো ছলছল করে। পাহাড়ে ধস নামার মতো একটা কান্নার চাপ যেন বুক থেকে বেরিয়ে আসতে চায়।

সঙ্গীরা আসে। দরবেশরা আসে। ডাকে: 'শাহ্‌জাদা!'

হঠাৎ উত্তর করতে পারেন না মখতুম শাহ্‌। হয়তো শুনতেও পান না।

'শাহ্‌জাদা!'

'কে?'

হঠাৎ যেন চমকে ওঠেন মখতুম শাহ্‌। চমক-লাগা বড় বড় তুটো চোখ তুলে তাকান। বলেন, 'কে? পীরসাহেব?'

'হ্যাঁ, শাহ্‌জাদা।'

এবার উঠে দাঁড়ান মখতুম শাহ্‌। পীরসাহেব এসেছেন। প্রেরণার উৎস পীরসাহেব! মখতুম শাহ্‌ উঠে এসে বাইরের বারান্দায় বসেন। বসেন পীরসাহেবও।

মরুপ্রান্তরে মুসাফির হাওয়া ধমকে ধমকে চলে যায়। নীল-নির্জন আকাশে হাজার তারা যেন চমকে চমকে ওঠে।

কাশ শুভ্র দাড়ির অরণ্যে হাত বুলোতে বুলোতে পীরসাহেব ডাকেন, 'শাহ্‌জাদা।'

'পীরসাহেব!'

'খোদার বান্দা!'

'পীরসাহেব!'

'খোদার মর্জি—'

পীরসাহেবের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জবাব দেন মখতুম শাহ্‌। 'খোদার মর্জি আমি হাসেল করবো পীরসাহেব। যাবো, আমি পূব দেশে যাবো। অবিশ্বাসী মানুষদের ডাকবো। রহমানের নাম বিলাবো।'

'শাবাশ! শাবাশ শাহ্‌জাদা!' বলে দু'হাত সামনে বাড়িয়ে খোদার দোয়া মাগে পীরসাহেব। তাঁর শান্ত, স্থির দু'টি চোখের তারায় যেন খুশীর ঢেউ খেলে যায়। রাত বাড়ে। কথা শেষ হয়।

কথাটা একদিন বাদশাহেরও কানে ওঠে। বাদশাহ্‌ ডাকেন মখতুম শাহ্‌কে। বলেন, 'কি, আমি শুনছি কি?'

মাথাটা একটু নীচু ক'রে মখতুম শাহ্‌ জবাব দেন, 'সত্য, সব সত্য পিতা।'

'তুমি পূব দেশে যাবে?'

'খোদার মর্জি।'

'খোদার মর্জি?'

কথাটা সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করতে গিয়ে হঠাৎ যেন থেমে যান বাদশাহ্‌। চুপ ক'রে কি যেন ভাবেন কিছুক্ষণ। মুখমণ্ডলে আলোছায়ার খেলা চলে। চোখ দু'টি ছলছল ক'রে ওঠে। বলেন, 'আচ্ছা যাও। আমি ভেবে দেখবো। আমি—ভেবে দেখছি।'

'বাবা!' নারী কণ্ঠ।

শাজাদি এসেছেন। তিনিই ডাকলেন বাদশাহ্‌কে।

বাদশাহ্‌ অবাক্‌ হলেন। বললেন, 'তুই? এ সময়ে আবার তুই কেন রে?'

'কেন, আমার কি আসতে নেই এখানে?'

'না, না। সে কথা নয়, সে কথা নয় রে। তবে কি জানিস মা—'

'খুব জানি বাবা, আমি কাছে এলে সব সময়ই তুমি এমনি ভাব দেখাও। আমায় যেন সইতে পারো না তুমি।'

'ওরে, মখদুম, ছাখ ছাখ। পাগলী আমার বলছে কি ছাখ। আমি নাকি সইতে পারিনে ওকে। আমি নাকি সইতে পারিনে ওকে'—

বলতে বলতে বাদশাহ্‌ মেয়ের দু'টি হাত ধরে কাছে টেনে নেন। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। বলেন, 'তোরা আমার আসমানের চান্দ-সূরজ, তোদের দেখতে পারবো না কিরে? এ কি কথা বলছিস!'

এবারে মাথা তুললেন শাজাদি। জল-ভরা দু'টি চোখকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আনলেন বাদশাহের মুখের উপর দিয়ে। তার পর বললেন, 'তবে কথা দাও।'

'কি কথা?' চমকে উঠলেন বাদশাহ্‌।

'আমায়ও যেতে দেবে।'

'কোথায়?'

'দাদার সঙ্গে।'

'পূব দেশে?'

'হয়তো তাই।'

'ওরে, না না। তুই যাস নে, তুই যাস নে। তুই আমার কাছে থাক মা, তুইও যদি যাবি তা হলে আমি থাকবো কি নিয়ে?'

'খোদা—খোদাতালার নাম নিয়ে।'

'না, না। আমি তা পারবো না। আমি তা পারবো না।' বলতে বলতে বাদশাহের চোখ দিয়ে একসময় জলের ধারা নেমে আসে। বাদশাহ্ পালঙ্কে বসে পড়েন।

একদিন সত্যি ঘর ছাড়লেন মখদুম শাহ্। সঙ্গে চললেন তিন ভাগনে, দ্বাদশ দরবেশ ও অনেক সাঙ্গোপাঙ্গ। সুযোগ মতো শাজাদিও সঙ্গ নিলেন। বাদশা চোখের জলে বিদায় দিলেন সবাইকে। 'স্নেহ-প্রেম সব ঝুটা' বাদশার বুক উজাড়-করা দীর্ঘশ্বাস।

জাহাজ নোঙর তুললো।

দিনের পর দিন গেলো। মাসের পর মাস। জাহাজ একদিন পাবনা জেলার পোতাজিয়ার চরে এসে আটকে গেলো।

মখদুম শাহ্ তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের বললেন, 'খোদার মর্জি, এখানেই নামতে হবে। আবাস গড়তে হবে। এখান থেকেই তাঁর নাম প্রচার আরম্ভ করো।'

ছাউনি পড়লো পোতাজিয়ার চরে। দরবেশরা ছুটলেন এদিক্ সেদিক্। গ্রামে গ্রামান্তরে।

লোক এলো। মেলামেশা হলো। চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো মখদুম শাহের নাম, দরবেশদের নাম। গ্রামের চাষীরা মুগ্ধ হলো মখদুম শাহের ব্যবহারে। প্রলুব্ধ হলো দরবেশের অলৌকিক ক্ষমতা দেখে। সবার মুখে এক কথাঃ 'ছাবতা আইচেন। তেনাগো গায়ের বন্ন ধবধবা ফর্সা। ইয়া লম্বা চওড়া। পক্ষীকে কয় নাইমা আয়, অমনি পটপট কইরা সব গাছ থিকা নাইমা আসে। কুত্তাকে কয় শুইয়া পড়, আর অমনি কুত্তাগুলান ঠ্যাং ছড়াইয়া চিত অইয়া শোয়।'

দিনে দিনে লোক জমে পোতাজিয়ার চরে।

পার্শ্ববর্তী এক গ্রামে বাস করেন এক হিন্দু রাজা। মখদুম শাহের কথাটা একদিন তাঁর কানে গিয়ে উঠলো।

রাজা উজিরকে ডাকালেন। নাজিরকে ডাকালেন।

বললেন, 'কি করা যায় এবার ?'

উজিরের পরামর্শ : 'বিষবৃক্ষকে অঙ্কুরে বিনাশ করতে হয়, একথা তো মহাজনগণ বলে গেছেন, মহারাজ।'

'হুঁ, অঙ্কুরেই বিনাশ করবো। যবনদের এ মাটি থেকে তাড়াবো। আপনি সৈন্যদের খবর করুন। তারা যেন তৈরী থাকে সব।'

'যথা আজ্ঞা মহারাজ।' বলে উজির-নাজির চলে গেলো।

মহারাজ একা ঘরে পায়চারি করলেন কিছুক্ষণ, তার পর দ্রুতপদে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

দু'পক্ষের মোকাবিলা হলো শাহ্‌জাদপুরের কাছাকাছি। প্রথম দু'বার জয়ী হলেন মখদুম শাহ্‌ই। কিন্তু তৃতীয় যুদ্ধে তাঁর বিপর্যয় হলো। মখদুম শাহ্‌ নিহত হলেন। নিহত হলেন তাঁর তিন ভাগনে আর দ্বাদশ দরবেশদের অনেকে।

শাজাদি যখন এ খবর পেলেন তখন গভীর রাত। বাতাস চঞ্চল। হুরাসাগর উত্তাল।

ঘরের বাইরে দাঁড়িয়েও ছটফট করছিলেন শাজাদি। একটা উত্তেজনা, একটা দুর্ভাবনা যেন ঘিরে ধরেছিল তাঁকে।

এমন সময় এক অনুচর খবর নিয়ে এলো।

চমকে উঠলেন শাজাদি।

অনুচর বললে, 'মা, সর্বনাশ হয়েছে মা।'

'দাদা, দাদা কোথায় ?' ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন শাজাদি।

অনুচরটি মাথা নীচু ক'রেই বললে, 'শাহ্‌জাদা নেই মা !'

'নেই, দাদা নেই ! ওঃ, খোদা !' বলেই শাজাদি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

কিন্তু বেশীক্ষণ পড়ে রইলেন না। একটু পরেই আবার উঠে বসলেন শাজাদি। তারা-ভরা আকাশের দিকে চাইলেন। চোখে জল নেই। জলের আভাসও নেই। দু'টি দীঘল চোখের কালো মণি এবারে যেন তারার মতোই দপ্‌দপ ক'রে জ্বলছে।

তার পরই ঘরে এলেন শাজাদি। একখানি কালো শাড়ি জড়িয়ে জড়িয়ে পরলেন। পশ্চিমমুখো হয়ে মনে মনে কার কথা যেন স্মরণ করলেন। এবারে আবার জল নামলো চোখে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন শাজাদি। মরুরাজ্যের নিভৃত প্রাসাদে থাকা একটি মুখ বুঝি তাঁর মনে পড়লো। অনেক কথা বুঝি প্রাণে বাজলো। তার পর এক সময় ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এলেন। সেই আকাশ, সেই তারা। সেই মাটি—সেই তরুলতা। সব সেই। কিন্তু এদের কেউ আজ শাজাদির জন্যে নয়। সবই যেন তাঁর পর। সামনে যে খালটি বেঁকে বেঁকে হুরাসাগরে গিয়ে পড়েছে, শাজাদির আপন বুঝি শুধু সেই খালটি। সেই খালই বুঝি তাঁকে ডাকছে। তাঁকে চাইছে। হ্যাঁ, যাবে বই কি শাজাদি!

শাজাদি খালে নামলেন। জলে ডুবলেন। আর উঠলেন না।

সতীত্ব রক্ষার জন্যে শাজাদি ডুবে মরেছিলেন। জনমানসে তাই তিনি সতী বিবি। এ খালের নাম তাই সতীবিবির খাল।

দয়ালচান্দের দীঘি



দীঘিতে আর জল নেই। শালুক-কলমীর ভিড় নেই। পলিমাটির স্নেহে সে-দীঘি আজ ভর ভর। তবুও তার নাম দীঘি। দয়ালচান্দের দীঘি। সে-নাম কেউ ভুলবে না।

আর ভুলবে কেমন ক'রে?

চাষীরা সেখানে কাজ করে লাঙলে তার বুক ফাড়ে। তারাই আবার গান গায়। দয়ালচান্দের গান। দয়াল চৌধুরীর গাথা। সে-গানে গাছ-গাছালি মাথা আছড়ায়। বাতাস করে উঃ উঃ। হু-হু। আর চৈত দুপুরের অমন আগুন আগুন রোদও ভিজে ভিজে লাগে। তাই সেখানে পাকা ধানের হলুদ-সমুদ্দুর দেখেও লোকে বলে দীঘি। দয়ালচান্দের দীঘি। এ নাম কেউ ভোলে না।

অনেককালের কথা।

বঙ্গ-বিহার ও উড়িষ্যার নবাব তখন মুর্শিদকুলী খাঁ। বাখরগঞ্জের দক্ষিণ দিক্ তখনও বন-জঙ্গলে ঘেরা। সাপ-বাঘের আড্ডা। সূর্যের আলো শাল-গজারির ডালে ডালে লেগে ফিরে যায়। ভয়ে তাও যেন—ভেতরে ঢুকতে পারে না। বন থাকে অন্ধকারে, সাপ-বাঘ আর ঝরাপাতার ক্লেদ নিয়ে।

কাছেই থাকে দয়াল চৌধুরী। ধনাঢ্য ব্যক্তি। সাত গাঁয়ে তার নাম-ডাক। ধনবানই নয় শুধু, দয়াল চৌধুরী বলবান। শাল-গজারির অরণ্যের দিকে সেই দয়াল চৌধুরীর চোখ পড়ে। দূরে নীলকান্ত সমুদ্রের ডাক তার কানে আসে। মনে মনে যেন কি ভাবে দয়াল

চৌধুরী। ভাবতে ভাবতে তার বড় বড় দু'টি চোখ জ্বলজ্বল ক'রে ওঠে। লোকজনদের কাউকে কাউকে বলে, 'জানো, জানো, দুঃখীর বাপ, এ জঙ্গলে আমি 'গঞ্জ' পয়দা করবো। মানুষের বসতি বসাবো। জঙ্গল আর জঙ্গল থাকবে না, লোকে লোকে ভরে উঠবে।'

দুঃখীর বাপ বলে, 'কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম। কর্তা মন করলে তা করতে পারেন বই কি! সব পারেন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুমি দেখে নিয়ো দুঃখীর বাপ, এ জঙ্গলে সেদিন কেমন সুন্দর গ্রাম বসেছে। কতো দেশের লোক এসেছে। তাদের মুখে আমার নাম। এই দয়াল চৌধুরীর নাম। কেমন, ভালো হবে না? ভালো লাগবে না তোমার?'

'ভালো হলেই ভালো লাগবে। ভালোটা ভালো না লাগে কার। কর্তার কাজ, আমার আরও ভালো লাগবে।'

দয়াল চৌধুরী কাজের লোক।

নবাব নাজিমের 'ফরমান' নিয়ে সত্যি সে কাজ আরম্ভ ক'রে দিলে। গাছে গাছে কুড়োল পড়লো, মাটিতে পড়লো কোদাল। বন-জঙ্গল সাফ। সাপ-বাঘেরা দূরে পালালো। ঝরা পাতার ক্লেদ সরলো। অন্ধকারের ঘোমটা-পরা মাটি ঘোমটা খুললো। সূর্যের মুখ দেখলে।

দয়াল চৌধুরী ডাকলে দুঃখীর বাপকে। বললে, 'কেমন, যেমনটি বলেছিলাম তেমনটি কিনা? ঠিক তেমনটি কিনা?'

হাসলে দুঃখীর বাপ। হাসি-খুশীর ফাগ লাগলো মুখে। হাসতে হাসতেই বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিক, ঠিক। কর্তা করেচেন কর্ম, সে কি আর বেঠিক হতে পারে? ঠিক তাকে হতেই হবে, ঠিক হতেই হবে।'

'হ্যাঁ, বোঝ, বোঝ ক্ষেমতা, দয়াল চৌধুরীর ক্ষেমতা!'

মুখের সঙ্গে চোখ দু'টিও হাসলো যেন দয়াল চৌধুরীর। দুঃখীর বাপের মুখে-চোখেও যেন তার ছোঁয়াচ লেগেছে।

কিন্তু এই হাসি--এই আনন্দ নিবলো একদিন। দয়াল চৌধুরীর মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়লো দুশ্চিন্তার ছায়া। অমন উজ্জ্বল মুখে কে যেন কালি মেখে দিলে। সে অন্য কথা। আরও পরের কথা।

বোজর গউমেদপুর পরগনার শাসক তখন আগা বাখর। নবাব প্রতিনিধি। শক্ত-সোমত্ত মানুষ। অত্যাচারী। তার কানে একদিন দয়াল চৌধুরীর কথা পৌঁছলো। পৌঁছলো নয়, আগা বাখরের এক অনুচর কথাটা তার কানে দিলে। বললে, 'হুজুর, দয়ালচান্দ!'

'সে আবার কে হে।'

'কি জানি হুজুর, লোকে তো তার কথাই কয়। বলে, আসমানে এক চান্দ, মাটিতে আর এক চান্দ। তার নাম দয়ালচান্দ।'

'হুঁ, তবে তো সেটা ভালো কথা নয়।'

'শুধু নয়? নিশ্চয় নয়। হুজুর একটা ব্যবস্থা করুন, নইলে যে আর রাজ্যে টেকা যায় না।'

আগা বাখর ভাবলে কথাটা। দু' চারজন পারিষদকেও জানালে। পরামর্শ করলে।

পারিষদেরা পরামর্শ দিলে, 'আর গৌণ নয়, ব্যাটাকে কোতল করুন। নইলে একদিন সে আপনার আসন ধরেই টান মারবে।'

'হুঁ, ভাবছি।'

একদিন দুঃখীর বাপ হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো দয়াল চৌধুরীর কাছে। জোর শ্বাস, ভয়-চমকানো দু'টি চোখের মণি।

দয়াল বললে, 'কি হে, এভাবে এলে? এভাবে ছুটে এলে? কি? ব্যাপারখানা কি?'

'কর্তা, ব্যাপার গুরুতর। আগা বাখর আসছে। সঙ্গে তার সেপাই-সান্ত্রী। বাতাসে তাদের পায়ের শব্দ। খটমট, গটগট! শুনলাম ওরা নাকি কর্তার রাজ্যি কেড়ে নেবে?'

'যাও, কি যে বলো! নিশ্চয়ই কেউ তোমায় ভয়ের ভূত দেখিয়েছে। নইলে এ আমার নবাব-নাজিমের ফরমান পাওয়া জমিদারী, তা দখল করতে আগা বাখর আসবে কেন?'

দয়াল চৌধুরী নিতান্ত তাচ্ছিল্য ভরে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল কথাটা। কিন্তু না। পারলে না।

পর পর আরও খবর এলো। নানা পথে নানা সূত্রে। দয়াল চৌধুরী চিন্তায় পড়লে।

কি করা যায়? বাধা দেবো? না। তা সম্ভব নয়, নবাবী ফৌজ। অনেক তাদের শক্তি। আমার বাধা তার সামনে টিকবে না। বালির বাঁধের মতোই তা ভেঙে পড়বে।

তবে? তবে?

অনেক ভেবে, অনেক চিন্তা ক'রে দয়াল চৌধুরী ঘর থেকে বেরুলো। আগা বাখরের সঙ্গে দেখা করতে চললো। লোকজন নিয়ে নয়, পাইক-বরকন্দাজ নিয়ে নয়। একা একা। শুধু একটি সোনার থালা সাজিয়ে নিলে মণি-মাণিক্য, হীরা জহরতে। উপঢৌকন। আগা বাখরের সেলামী।

দয়াল চৌধুরীকে দেখে আর ঐ দামী দামী মণি-মাণিক্য পেয়ে আগা বাখর তো খুশী। মহাখুশী! এমন একটি লোক এতো সহজে নুইবে এ তো সে ধারণাই করতে পারে নি। তাই দু' চারিটি মিষ্টি কথা বলে, পান তামাক খাইয়ে দয়াল চৌধুরীকে বিদায় করলে সে।

কিন্তু আগা বাখরের লোভ কমলো না। বরং তা বেড়ে গেলো। সঙ্গে জুটলো আগা সাদক। আগা বাখরেরই ছেলে। বাপ আর পুতের অত্যাচারে বোজর গউমেদপুরের প্রজারা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়লো।

তাদের গোলায় ধান থাকে না, পুকুরে মাছ থাকে না, গাছের ফল পাকতে পায় না, আগা বাখরের অনুচরেরা এসে লুটেপুটে নিয়ে যায়।

শুধু কি তাই? আগা বাখর আর আগা সাদক—বাপ আর পুতের খিদে অনন্ত। তাই তাদের ভোগের খিদে মেটাতে প্রজার স্ত্রী-কন্যাদের ডাক পড়ে।

যে যেতে চায় না, তাকে চুল ধরে টেনে নিয়ে যায়। যারা বাধা দেয় তাদের বাড়ি-ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। রাতের অন্ধকারে চোখের জল রেখে প্রজারা তাই দেশ ছেড়ে পালায়। দয়াল চৌধুরীর হাতে গড়া দেশে আবার বন-জঙ্গল দেখা দেয়।

দয়াল দরবারে যায়। সকল কথা জানায়, কিন্তু কোন প্রতিকার হয় না।

একদিন।

একদিন দয়াল চৌধুরী এসেছে দরবারে। আগা সাদক তাকে ডাকলে।

দয়াল এলো।

আগা সাদক বললে, 'তোমার কন্যাকে আজ দেখলাম—।'

দয়াল চৌধুরীর মাথায় যেন রক্ত উঠলো। চোখ দু'টি লাল লাল হলো। পা দু'টি ঝিমঝিম করলো। কথা বললে না দয়াল চৌধুরী। কিংবা বলতেই পারলে না। আগা সাদকই আবার বললে, 'বেশ মোটাসোটা হয়েছে। বুকটিও ভরেছে, গায়ের রঙটিও খাসা।'

'আগা সাদক!'

হঠাৎ বাজ পড়ার মতো যেন হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠলো দয়াল চৌধুরী।

আগা সাদক রাগলো না। যেমন ছিল তেমনই বসে রইলো। নেশা জড়ানো চোখের ঢুলুঢুলু দু'টি দৃষ্টি দয়াল চৌধুরীর মুখের উপর ফেলে সে আবার বললে, 'অমন ক'রে উঠলে কেন দয়াল? তোমার মেয়েকে আমার চাই। ও পরীকে না পেলে আমি পাগল হয়ে যাবো। বুঝলে হে, আমি পাগল হয়ে যাবো।'

দয়াল চৌধুরী কোন উত্তর দিলে না। দাঁতে দাঁতে কটকট

করতে করতে একবার শুধু এদিক্ ওদিক্ চাইলে। আগা সাদকের ইয়ার বন্ধুরা বললে, 'প্রজার কন্যা রাজা ভোগ করবে, সে তো প্রজার পরম সৌভাগ্য। তুমি তাতে আপত্তি করছো কেন হে ?'

দয়াল চৌধুরীর শরীরটা এবার যেন থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো। চোখ দু'টি যেন জবা ডুগডুগ। সে আর দাঁড়ালো না, একটা কথাও বললে না। মনের অনেক আগুনকে চাপা দিয়ে সে স্থান ত্যাগ করলে।

পরদিন পালকি গেলো দয়াল চৌধুরীর বাড়িতে।

'কি ?'

'পালকি।'

'কে পাঠিয়েছে ?'

'আগা সাদক।'

'কেন ?'

'ইস, জানো না যেন, তোমার মেয়ে—'কথা শেষ হলো না। দয়ালের হাতের শক্ত লাঠি গিয়ে পড়লো লোকটির মাথায়। লোকটি ছিটকে পড়লো। তাই দেখে তার সঙ্গের লোকজনও নিজ নিজ প্রাণ নিয়ে সোজা পথ ধরলে।

দয়াল চৌধুরী ঘরে এলো।

স্ত্রী বললে, 'ওগো এ কি করলে ? এ তুমি কি করলে ?'

'চুপ করো। কথা বলো না। এখনই ওরা আসবে। হিংস্র বাঘের মতো তেড়ে আসবে। তার আগেই—'

'তার আগেই ?'

'তার আগেই আমাদের সরে পড়তে হবে।'

'সরে পড়তে হবে ? এই বাড়ি-ঘর ছেড়ে—'

'কেঁদো না। কথা বলো না। তৈরী হও। এক্ষুণি বেরিয়ে পড়তে হবে।'

একটু থেমে আবার বললে, 'ওরা কই? ওরা? বৌমা, খুকীরা?'

'ঐ তো ও ঘরে। ভয় পেয়েছে। কাঁদছে।'

'কাঁদছে? দয়াল চৌধুরীর মেয়ে? বাঘের রাজ্য কেড়ে নিয়ে যে নগর বসিয়েছে সেই দয়াল চৌধুরীর?'

দয়াল চৌধুরী দাঁড়ালে না। পাশের ঘরে গেলো।

কিন্তু পালানো হলো না দয়াল চৌধুরীর। তার আগেই খবর এলো। নবাবের ফৌজ এসে গেছে। সারা গ্রাম তারা ঘিরে ফেলেছে। পালানোর পথ বন্ধ।

'তবে? তবে কি হবে? শেষে কি—' কথা শেষ হলো না। দয়াল চৌধুরীর স্ত্রীর কণ্ঠটা যেন চেপে এলো। কথা তার আটকে গেলো। চোখের জল আর বাধ মানলো না। ঝরঝর ক'রে ঝরে পড়লো।

দয়াল বললে, 'কাঁদছো?'

স্ত্রীর মুখে উত্তর নেই।

দয়াল আবার ডাকলে। আবার বললে, 'কাঁদছো? ছিঃ, কেঁদো না। কেঁদে কি হবে? নবাবের ফৌজ ফিরে যাবে? না। তা যাবে না। তবে? তবে চোখে জল কেন? জল মোছো। হাসি মুখে আমাদের বিদায় দাও। আমরা যাই।'

'যাবে? কোথায়?'

'কেন, যুদ্ধে।'

'জীবনের চেয়েও মান বড়। আগা সাদক সেই মানেই আমার আঘাত করেছে। আর কি আমি ঘরে থাকতে পারি?'

'আর আমরা?'

'তোমরা? তোমরা কি করবে?'

'আমাদেরও তো মান আছে, সম্ভ্রম আছে।'

হঠাৎ এ কথার উত্তর দিতে পারলে না দয়াল চৌধুরী। থামলে। কি যেন ভাবলে। তার পর বললে, 'হ্যাঁ, কথাটা ঠিক বলেছো।

যদি আমাদের বিপদ হয়, যদি আমরা না ফিরি—তাহলে ? তাহলে তোমরা কি করবে ?'

'কি করবো ? তা—তা বোধ হয় এতক্ষণে ঠিক হয়ে গেছে ?'

'কি ! তুমি কি বলছো ?'

'হ্যাঁ, ভেতর দুয়ারে দীঘি আছে। সেই দীঘিতে নাও আছে। আমরা গিয়ে সেই নায়ে উঠবো। অপেক্ষা করবো। যদি বুঝি তোমাদের বিপদ হয়েছে তাহলে—'

'তা হলে ?'

'মা গঙ্গা আমাদের লজ্জা ঢাকবেন। নাও-এর তলায় ফুটো ক'রে নাওকে আমরা ডুবিয়ে দেবো। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ডুববো। আগা সাদকের পাপ হাত আমাদের স্পর্শও করতে পারবে না।'

স্ত্রীর কথাগুলো শুনে ভারী আনন্দ হলো দয়াল চৌধুরীর। স্ত্রীকে আলিঙ্গন করতে করতে বললে সে, 'পারবে ? আমাদের বিপদ হলে পারবে নিজেদের মান বাঁচাতে ?'

শাড়ির আঁচলে দু'টি চোখ মুছে স্ত্রী বললে, 'পারবো। আমি যে তোমার স্ত্রী—সহধর্মিণী।'

আর চিন্তা নেই দয়াল চৌধুরীর। এবারে খোলা তলোয়ার হাতে সে রাস্তায় বেরুলো। সঙ্গে ছুটলো অনুচরেরা। পাইক-বরকন্দাজেরা। পুরনারীরাও নাও নিয়ে মাঝ দীঘিতে গিয়ে রইলো।

সন্ধ্যা এলো গাঢ় হয়ে। পশ্চিম দিগন্তের শেষ রক্ত রেখাটুকুও মুছে গেলো। অন্ধকার কালো চুলের মতো গাছ-গাছালির মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে গড়িয়ে পড়লো। আজ আর সন্ধ্যা দীপ জ্বললো না কারো ঘরে। বাজলো না মঙ্গল শাঁখ। মন্দিরে মন্দিরে উঠলো না প্রার্থনা সংগীত। কেবল কয়েকটি শেয়াল বন-বাদাড়ে হাউহাউ ক'রে উঠে গৃহস্বামীকে সন্ত্রস্ত ক'রে তুললে।

কিন্তু মশাল জ্বললো দয়াল চৌধুরীর সর্দারদের হাতে। সেই মশালের আলোয় প্রতিটি মুখ যেন দীপ্ত হয়ে উঠলো। দোল লাগলো রক্তে। কলিজা উঠলো লাফিয়ে। সেই উত্তেজনায় সর্দাররা ডাক ছাড়লে, 'হে···হে···রে···রে···হে হে হে···রে রে রে··· ।'

সে ডাক পথ ছাড়িয়ে মাঠ পেরিয়ে গৃহস্থদের চালের বাতায় বাতায় বাজলো। তার শব্দে মায়ের কোলের শিশুরা একবার চীৎকার ক'রে উঠে আবার যেন নিশ্চুপ হয়ে গেলো।

দলের সম্মুখ থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠলো হঠাৎ, হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার ভাই। তুশমন সামনে।

হ্যাঁ। ও পাশের ঐ বট গাছটার আড়াল দিয়ে নবাবের ফৌজও এগিয়ে আসছে। এগিয়ে এসেছে আগা সাদক। বিপুল তার বাহিনী। প্রচুর তার আয়োজন। নবাবী ফৌজের স্রোতের টানে ভেসে যাবে বুঝি দয়াল চৌধুরীর মুষ্টিমেয় অনুচরেরা।

কিন্তু দয়াল দমলে না। থামলে না।

লাফিয়ে উঠলো, ঝাঁপিয়ে পড়লো সে নবাবী ফৌজের মাঝে। রক্ত···রক্ত ঝরলো নরম সবুজ ঘাসে। রক্ত মাখলো সরস পলিমাটি। তার পর নিজেও ক্ষতবিক্ষত হয়ে, সারা অঙ্গে নিজেও রক্ত মেখে এক সময় সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। যে মাটি ছিল তার সন্তানের মতো, যে মাটিকে সে-ই সূর্যের আলো দেখিয়েছিল সেই মাটিতেই জীবন তার শেষ হলো।

ওদিকে কাঁপন লাগলো দীঘিতে। কেঁপে উঠলো নাও। নাও-এর লোকেরা। খবর এনেছিল দয়ালের এক অনুচর। খবর শুনে দয়াল চৌধুরীর স্ত্রী আজ কাঁদলে না। মেয়ে ও ছেলের বৌকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে মাঝিকে বললে সে, 'মাঝি, আর তো সময় নেই। তুমি তোমার কাজ করো।'

ঠিক ছিল সবই। বুড়ো মাঝি আঁচলে একবার চোখ মুছে কুড়োল নিলে হাতে। নায়ে মারলে কোপ। নায়ের তলা কেটে

গেলো, ফেটে গেলো। আর সঙ্গে সঙ্গে তা তলিয়ে গেলো দীঘির অতল জলে।

আগা সাদক যখন দয়াল চৌধুরীর বাড়িতে পা দিলে তখন সারা বাড়ি ভাঁভাঁ করছে। সব শূন্য, একেবারেই শূন্য। তার আসবার অনেক আগেই সব কিছু শেষ হয়ে গেছে।

রায়বাঘিনী ভবশঙ্করী



ওসমান! ওসমান! মনে মনে ওসমানের নাম উচ্চারণ করলেন ভবশঙ্করী। তাঁর মুখের যেন রঙ বদল হলো। আপেল-লাল দু'টি কপোল আরও যেন রক্তিম হয়ে উঠলো। চোখের আরশি ঝিকমিক। দু'চোখের ঘন কৃষ্ণ তারায় যেন কিসের বিদ্যুৎ খেলে গেলো।

বসেছিলেন। হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন ভবশঙ্করী। আঙিনায় খানিকক্ষণ পায়চারি করলেন। বাম হাতের চম্পা-হলুদ আঙুল-গুলো কালো কেশের বন্যায় ডুবিয়ে দিলেন কয়েকবার। কুন্দ-কলি দাঁতে দাঁতে চেপে ধরলেন অধর-ওষ্ঠ।

চোখে চিন্তার গভীরতা, কপালে কুঞ্চিত রেখা।

বুড়ো মন্ত্রী দাঁড়িয়েছিলেন। অপেক্ষা করছিলেন। এবার ডাকলেন, 'মা!'

হঠাৎ যেন হুঁশ হলো ভবশঙ্করীর। চিন্তা সমুদ্রে যে মন ডুবে ছিল, এবারে সে ভেসে উঠলো।

ফিরে তাকালেন তিনি। কাছে এলেন।

মন্ত্রী আবার বললেন, 'পাঠান সর্দারের কাছে কি জবাব পাঠাই, মা?'

ভোরের রোদ ছড়িয়ে পড়েছে—গড়িয়ে পড়েছে ঘরে। রোদ লেগেছে ভবশঙ্করীর সারা অঙ্গে। রোদের সোনায় ভবশঙ্করী আরও যেন দীপ্ত হয়ে উঠেছেন।

মন্ত্রী একবার ভবশঙ্করীর মুখের দিকে তাকালেন।

না, এ মুখ তো স্বাভাবিক নয়। স্নেহ ঢলঢল যে শান্তশ্রী—ভবশঙ্করীর মুখে-চোখে লেগে থাকে সে শ্রী যে একেবারেই অন্তর্হিত হয়েছে। চোখ দু'টি যেন জ্বলছে। দৃষ্টিতে ক্ষুরের তীক্ষ্ণতা। ললাটে চিন্তার ছাপ। ভাস্বর। তবে কি উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন রানী? ভবশঙ্করী? উত্তেজনার উত্তাপে তিনি কি কাঁপছেন? তাই কি তিনি পায়চারি করছিলেন এতক্ষণ?

মন্ত্রীর মনে নানা কথার উঁকিঝুঁকি।

ভবশঙ্করী বললেন, 'বসুন।'

বসলেন। দু'জনেই। পাশাপাশি।

ভবশঙ্করী আবার টেনে নিলেন পাঠান সর্দার ওসমানের পত্র। চোখ বুলোলেন তাতে। বড় সাধ হয়েছে ওসমানের। দিল্লীর বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করবেন। মোগল সাম্রাজ্য ভাঙবেন। স্বাধীন পাঠান রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করবেন। তাই ভবশঙ্করীর সাহায্য চান ওসমান। সৈন্য সাহায্য। অর্থ সাহায্য। ভবশঙ্করীর লাভ? লাভ নিশ্চয়ই আছে। নগদ লাভ। ভূরিশ্রেষ্ঠের পূর্ণ স্বাধীনতা। ধন-সম্পদ লাভ। প্রতিপত্তির প্রতিষ্ঠা। হ্যাঁ, ভারি মিষ্টি চার ফেলেছেন ওসমান। রসালো প্রলোভন। ওসমানের আশা, ভবশঙ্করী এ 'চার' নিশ্চয়ই গিলবেন। কথাটা মনে হতেই আবার মুখের রঙ বদলালো ভবশঙ্করীর। দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা নিবলো। একটা মিষ্টি হাসির ফুলঝুরি ফুটলো মুখমণ্ডলে। ঠোঁট দু'টিতে একটা বিদ্রূপ লেখে

লেগো। একটু ছড়িয়ে গিয়ে আবার সংযত হলো ঠোঁট দু'টি। মনে মনে একটি কথা ভাবলেন ভবশঙ্করী ঃ 'নির্বোধ!'

মন্ত্রী বললেন, 'আমি বলি কি মা…।' বলতে বলতে হঠাৎ থামলেন মন্ত্রী। ভবশঙ্করীর মুখমণ্ডলে দু'টি পাকা চোখের দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলেন।

ভবশঙ্করী বললেন, 'বলুন। আপনি কি ভেবেছেন আগে তাই শুনি।'

'আমি বলি মা, কি কাজ আমাদের এ সবের মধ্যে থেকে? দিল্লীর সিংহাসনে সম্রাট আকবর। বিশাল ভারত জুড়ে মোগল শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর নয়া বিধানে হিন্দু রাজন্যবর্গও খুশী। এ সময়ে মোগল শক্তিকে ঘায়েল করা তো সহজ হবে না।'

'হুঁ!' ডান হাতের চেটোয় মাথার ভার রেখে ছোট্ট একটু হুঁ করলেন ভবশঙ্করী। কি যেন ভাবলেন। তাঁর চোখের কালো মণি দু'টি একবার যেন জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো।

'তা ছাড়া'—আবার আরম্ভ করলেন মন্ত্রী, 'তা ছাড়া মোগলরা তো আমাদের কোন অসুবিধে করে নি, মা। বছর শেষে দিল্লীশ্বরকে ভুরিশ্রেষ্ঠের সেলামী দিতে হয় মাত্র একটি স্বর্ণমুদ্রা, একটি ছাগল আর একটি কম্বল। এ-টুকুই শুধু বাধ্যবাধকতা। এ-ছাড়া তো দিল্লী আমাদের উপর কোন বাধা-নিষেধ চাপায় নি! আমার তো…'

মন্ত্রীর কথা শেষ হলো না। ভবশঙ্করী কথা কেড়ে নিলেন। নিজেই আরম্ভ করলেন, 'আমিও তাই মনে করেছি মন্ত্রীমশাই। যাকে চিনি নি তাকে বিশ্বাস করার চেয়ে যাকে জেনেছি তাকে বিশ্বাস করা ভালো।'

'আর!'—আগ্রহে চোখ দু'টি তুলে ধরলেন মন্ত্রী।

ভবশঙ্করী বললেন, 'আর ওসমানের স্পর্ধা দেখে আমি তো অবাক্ হয়ে গেছি মন্ত্রীমশাই। পাঠানদের বুকে কতো জোর যে, তারা মোগলদের কাবু করার স্বপ্ন দেখে!'

'লোভ! লোভ! বুঝলে না মা, লোভ মানুষকে পাগল ক'রে দেয়। অন্ধ ক'রে দেয়। ঐ যে কথায় বলে না, পিপীলিকার পাখা হয় মরিবার তরে; ওসমানেরও হয়েছে তাই। নইলে সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে লড়বার মতো শক্তি তার কই? মরবে মা, মরবে। তুমি দেখে নিও, ওরা সব জ্বলে-পুড়ে মরবে। অমন বড় বড় রাজ-রাজড়া মোগলদের চাপে গুঁড়ো হয়ে গেলো, আর ওসমান তো ফুঃ—ফুঁ দিয়েছে, কি উড়ে গেছে।' বলে মন্ত্রী জিহ্বায় একটা শব্দ করলেন। সে শব্দে তাঁর কথার ফলা আরও যেন শানিত হয়ে উঠলো।

একটু হাসলেন ভবশঙ্করী। মন্ত্রীর দু'টি পাকা চোখের ভাব দেখে হাসলেন। বললেন, 'তাহলে পাঠান সর্দারকে একটা জবাব দিয়ে দিন মন্ত্রীমশাই।'

'নিশ্চয়! নিশ্চয়! আজই লিখে দিচ্ছি মা, ভূরিশ্রেষ্ঠের এক কথা, সে বেইমান হবে না। বিশ্বাসঘাতক হবে না।' বলে মন্ত্রী প্রায় নাচতে নাচতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ভবশঙ্করীর দু'টি চোখে—দু'টি ঠোঁটে আবার হাসি ফুটে উঠলো।

বর্ধমান, হাওড়া, হুগলী ও মেদিনীপুরের কিছুটা অঞ্চল জুড়ে সে-কালের ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য। ধনবান শ্রেষ্ঠীদের বাসস্থান বলেই এই রাজ্যের নাম ভূরিশ্রেষ্ঠ।

ভূরিশ্রেষ্ঠ-রাজ রুদ্রনারায়ণ রায়ের যখন মৃত্যু হয়, দিল্লীর সিংহাসনে তখন সম্রাট আকবর।

মৃত্যুর পূর্বে রুদ্রনারায়ণ মহিষীকে কাছে ডাকলেন। ভবশঙ্করী ভেঙে পড়লেন রুদ্রনারায়ণের বুকে। চোখের জলের ঢল নামলো।

রুদ্রনারায়ণ বললেন, 'কেঁদো না গো। ওপারের ডাক এসেছে, তাকে ফেরানো যায় না। উপায় নেই।'

'মহারাজ!'

'কেঁদো না, রানা। একদিন তুমিও যাবে। সবাইকেই যেতে হবে।'

'মহারাজ!'

'ভূরিশ্রেষ্ঠ রইলো ভব, এবারে রাজ্যের ভার তোমাকেই বইতে হবে। ভূরিশ্রেষ্ঠের মান রেখো। রায়বংশের ইজ্জত রেখো তুমি। এর বেশী আর তোমাকে কি বলবো?'

বলার প্রয়োজনও ছিল না। ভবশঙ্করী ছিলেন গুণবতী। বুদ্ধিমতী। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি শক্ত হাতেই শাসন-রজ্জু ধরলেন। রাজ্যের মান বাড়লো। প্রতিপত্তি বাড়লো। দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়লো ভূরিশ্রেষ্ঠের কথা। পাঠান সর্দার ওসমানও সে-কথা শুনেছিলেন। জেনেছিলেন। তাই তিনি অনুরোধ জানালেন ভবশঙ্করীকে মোগলের বিরুদ্ধে তাঁকে সাহায্য করতে।

কিন্তু না। ওসমানের অনুরোধ রক্ষা করলেন না ভবশঙ্করী। স্পষ্ট কথা বলে দিলেন। লিখে পাঠালেন: 'পাঠান সর্দারের অনুরোধ রক্ষা করতে ভূরিশ্রেষ্ঠ সম্পূর্ণ অক্ষম।'

'অক্ষম!' চিঠি পেয়েই লাফিয়ে উঠলেন পাঠান সর্দার ওসমান।

'ভূরিশ্রেষ্ঠ অক্ষম?' ওসমানের গোল গোল দু'টি লাল চোখ আরও যেন লাল হয়ে উঠলো। উত্তেজনায় থরথর ক'রে কেঁপে উঠলেন তিনি। দাঁতে দাঁত চেপে চুপ ক'রে রইলেন কিছুক্ষণ। কি যেন ভাবলেন। তার পর বললেন, 'অক্ষম? পাঠান সর্দার ওসমানকে চেনেন নি ভাবশঙ্করী। তাই এ কথা বলতে তাঁর সাহস হয়েছে। অক্ষমকে কি ক'রে সক্ষম করা যায় ওসমানের সে কৌশলটাও অজানা নয়। ভূরিশ্রেষ্ঠ শিগগিরই সে পরিচয় পাবে।' কোমরে বাঁধা তলোয়ারটাকে কোষমুক্ত ক'রে ওসমান তার তীক্ষ্নতা পরীক্ষা করলেন। তাঁর চোখের মণি দু'টিতে যেন সাপের হিংস্রতা।

ভক্তিমতী ভবশঙ্করী।

বলেন, 'ঐশ্বর্যে আমায় ভুলতে পারবে না কেউ। আমার শুধু মায়ের শ্রীচরণ ভরসা। ঐ চরণ ধরেই আমি সত্যের শরণ নেবো। আমার আবার ভয়-ডর কিসের?'

তাই মাঝে মাঝেই রাজধানী গড়ভবানীপুর ছেড়ে বাইরে যান ভবশঙ্করী। চৌদ্দ পনের মাইল দূরের পথ বাসডিঙ্গা গড়ে যান। বাসডিঙ্গা গড়ে মায়ের মন্দির, সেখানে পূজো-আর্চায় দিন কাটান।

বুড়ো মন্ত্রী বলেন, 'বাসডিঙ্গায় আর যেয়ো না মা। অনেক দূরের পথ। রাস্তাঘাটও সুবিধের নয়। আর তা ছাড়া...'

চোখ তুলে তাকান ভবশঙ্করী। বলেন, 'তা ছাড়া?'

'ওসমানকে তো তুমি জানো না, মা। ও সাক্ষাৎ শয়তান। স্বার্থ ছাড়া কিছু বোঝে না। তাই আমার ভয় হয়—'

'ভয়?'

'হ্যাঁ, মা। শুনেছি, তোমার চিঠি পেয়ে ওসমান ক্ষেপে উঠেছে। তাই, ও যদি চুপ ক'রে বসে না থাকে?'

এবার হেসে ফেলেন ভবশঙ্করী। বলেন, 'সেই ভয়ে আমায় ঘরে বসে থাকতে হবে? আপনি কি বলছেন মন্ত্রীমশাই! মায়ের কাছে যাই, যদি তেমন একটা বিপদ হয়, তা হলে মা-ই রক্ষা করবেন। আর তা ছাড়া, নারী হলেও এ তু'টি বাহুতে কি কম শক্তি মন্ত্রীমশাই, তু'হাতে পারবো না শয়তানের গলাটা টিপে ধরতে?'

ভবশঙ্করীর চোখে হাসির বিত্যুৎ। তু'টি লাল কপোলে তার প্রতিফলন।

বুড়ো মন্ত্রী কথা বাড়ান না। আমতা-আমতা ক'রে বলেন, 'তা তুমি পারবে বই কি, তা তুমি পারবে বই কি মা; তুমি যে দনুজদলনী মহাশক্তি। তাই তো আমরা বলে বেড়াই...'

বুড়ো মন্ত্রীর কথা শেষ হয় না। রানী ভবশঙ্করী ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন।

সেদিন অমাবস্যা।

সামান্য ক'জন দেহরক্ষী নিয়ে বাসডিঙ্গা গড়ের মন্দিরে গেলেন ভবশঙ্করী। আজ সারা রাত ধরে মায়ের আরাধনা চলবে। অমাবস্যার কাল-রাত্রিতেই তো মহাকালীর পূজোর সময়।

সন্ধ্যা থেকেই আয়োজন চলেছিল।

ক্রমে রাত গভীর হলো। ঘন কালো চুলের মতো ঘুটঘুটে অন্ধকার উড়ে এলো গাছ-গাছালির মাথা ছুঁয়ে। দেবমন্দিরের অলি-গলি বেয়ে। অন্ধকারে ডুবে গেলো দেবমন্দির।

ভবশঙ্করী পূজোর ঘরে বসেছিলেন। আলুলায়িত কেশ। ধবধবে সাদা থান পরনে। কপালে কয়েক ফোঁটা রক্তচন্দন। প্রদীপের স্তিমিত আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছে মুখে-চোখে। কি এক প্রার্থনায় ভবশঙ্করী নিজেই যেন শিখা হয়ে জ্বলছেন।

হঠাৎ বাইরে গোলমাল। প্রচণ্ড কলরব। হা···হা···হা···হৈ··· হৈ···হৈ···। প্রথমটায় খেয়াল করেন নি ভবশঙ্করী। ভেবেছিলেন শাল-পিয়ালের বনে আকণ্ঠ মহুয়া খেয়ে সাঁওতালরা হয়তো নৃত্য শুরু করেছে। মাদল বাজছে ডিম···ডিম···ডিম····ঢিম·· ঢিম··· ঢিম···। কিন্তু না। গোলমাল ক্রমশ বেড়েই চললো।

ভবশঙ্করী আসন ছেড়ে উঠলেন। বাইরে এসে দাঁড়ালেন। অন্ধকারের বুকে তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মতো বিদ্ধ হয়েছে শতশত মশাল। কারা যেন মশাল নিয়ে মন্দিরের দিকে এগিয়ে আসছে। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে রইলেন ভবশঙ্করী। কারা? ওরা কারা? এত রাতে ওদের কি প্রয়োজন? নানা প্রশ্ন ঝাঁকে ঝাঁকে ভবশঙ্করীর মনে এলো।

একজন দেহরক্ষী দৌড়ে এসে বললে, 'মা, সর্বনাশ হয়েছে।'

ফিরে দাঁড়ালেন ভবশঙ্করী। বললেন, 'কি? ব্যাপার কি?'

'রাতের অন্ধকারে পাঠানরা দেবমন্দির আক্রমণ করেছে, মা।'

'পাঠানেরা? পাঠান সর্দার ওসমান?'

'হ্যাঁ মা, ওসমানই তার দলবল নিয়ে এসেছে।'

ভবশঙ্করী আর দাঁড়ালেন না। অপেক্ষা করলেন না। দ্রুত মন্দিরে প্রবেশ করলেন।

মন্দিরে লোল রসনা ধকধক নয়না কালীর করালিনী মূর্তি। প্রদীপের মৃদু আলোকে ভয়ঙ্করী জননী আরও যেন রহস্যময়ী। পুরোহিত পূজো শুরু করেছেন। তাঁর থমথমে কণ্ঠের মন্ত্রধ্বনি মন্দিরের কার্নিসে কার্নিসে বাড়ি খেয়ে যেন ঝনঝন ক'রে বাজছে।

মায়ের সামনে প্রণাম ক'রে ভবশঙ্করী বললেন, 'মা, মাগো, শক্তি দে মা, শক্তি দে।'

ভবশঙ্করীর প্রার্থনায় চমকে উঠলেন পুরোহিত। মুখটাকে একটু ঘোরালেন। দেখলেন, রানীর ছু'চোখ দিয়ে যেন ঠিকরে আগুন বেরুচ্ছে। সারা মুখে যেন বিদ্যুতের অগ্নি-জ্বালা।

পুরোহিতের কণ্ঠস্বর এবার যেন কেঁপে কেঁপে উঠলো।

ভবশঙ্করী বললেন, 'পাঠানরা মন্দির আক্রমণ করেছে ঠাকুরমশাই, আমি সেখানেই যাচ্ছি। দেখবেন মায়ের পূজো যেন কিছুতেই বন্ধ না হয়।'

বলে আর দাঁড়ালেন না ভবশঙ্করী। তাড়াতাড়ি বাইরে গেলেন। বেলগাছে একটা ঘোড়া বাঁধা ছিল। তাতে চড়ে দেহ-রক্ষীদের হুকুম করলেন, 'এগিয়ে চলো।'

বাসডিঙ্গা গড়ের বাতাস সে আহ্বানে ঝমঝম ক'রে উঠলো।

ভবশঙ্করীর ঘোড়া আবার যখন মন্দির প্রাঙ্গণে এসে থামলো তখন রাতের শেষ প্রহর। পূজো শেষ হয়েছে অনেক আগে। পুরোহিত আঙিনায় দাঁড়িয়েছিলেন। ভবশঙ্করীকে দেখে ছুটে এলেন।

ঘোড়া থেকে নামলেন ভবশঙ্করী। বিজয়িনী বীরাঙ্গনা।

পুরোহিত ডাকলেন, 'মা!'

'পাঠানরা হঠেছে ঠাকুরমশাই, ওসমান পালিয়েছে।'

'জয় মা, মাগো।' পুরোহিত-ঠাকুর আনন্দে জয়ধ্বনি ক'রে উঠলেন। জয়ধ্বনি করলো অন্যান্য সঙ্গীরা। বাসডিঙ্গা গড়ের ভোরের বাতাস সে জয়ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠলো। ভবশঙ্করী ধীরে ধীরে মায়ের মন্দিরে প্রবেশ করলেন।

রানী ভবশঙ্করীর এ বীরত্বের কথা একদিন দিল্লীতে গিয়ে পৌঁছলো। শুনে বিস্মিত হলেন দিল্লীশ্বর আকবর। দূত পাঠালেন ভূরিশ্রেষ্ঠে। দূত বয়ে নিয়ে এলো গুণমুগ্ধ আকবরের প্রশংসা। কৃতজ্ঞতা। ভবশঙ্করীর বীরত্বের স্বীকৃতি এলো তার সঙ্গে। সম্রাট আকবর রানী ভবশঙ্করীকে 'রায়-বাঘিনী' উপাধিতে ভূষিত করলেন। রায়বংশের বধূ রানী ভবশঙ্করীর 'রায়-বাঘিনী' নাম দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়লো।

রূপের আগুন



প্রাসাদের কাছেই কুঞ্জবন। পূর্ব সীমানায় যে রূপালী নদীটি চমকে উঠে বাঁক নিয়েছে তার পাশেই। রাজা বল্লাল বড় সুন্দর ক'রে গড়েছেন কুঞ্জবনটি। দেশ-বিদেশের ফুলের ঝালর কুঞ্জবনে, তার মাটিতে কচি-সবুজ ঘাসের গালিচা। মাঝখানে হরিণীর কালো-স্নিগ্ধ চোখের মতো সুন্দর একটি তড়াগ। কোথাও কোথাও ছোট ছোট পথও আছে। নারীর মাথার সিঁথির মতো সোজা-সটান পথ। সেই পথ এক-একটি সীমান্তে গিয়ে হারিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে এক-একটি ফুলের কেয়ারির মাঝখানে।

রাজা বল্লাল রোজই এখানে বেড়াতে আসেন। সকাল-বিকেল দু'বেলাই। ফুলের গন্ধে কেমন যেন মদির হয়ে ওঠে তাঁর মনটি। রূপালী নদীর রূপার-পাত জল কেমন যেন নেশা ধরায়। আনমনে সারা কুঞ্জ ঘুরে কখন তড়াগটির পাশে এসে বসেন রাজা বল্লাল। তড়াগের কালো-স্নিগ্ধ জল সকালের হলুদ-হলুদ রোদে ঝিলমিল করে। বিকেলের আবীর রাঙা রোদ তার বুকে নতুন রাগের দাগ কেটে যায়। চোখ মেলে রাজা বল্লাল সবই দেখেন। দেখতে দেখতে মনের অতলে ডুবে যান। সেই অতল রাজ্যের রাজ-মহলে কতো গোলাপ-কুঁড়ি মুখ, কতো কাজল-টানা চোখ ফুটে ওঠে।

মনের অজান্তে রাজা বল্লালের বুক থেকে একটা উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মিশে যায়। সেই বাতাসের ঠোঁট লেগে রূপালী নদী

সিরসির করে। লাল গোলাপের নরম নরম বুক কেঁপে কেঁপে যায়।

একদিন বিকেলে কুঞ্জে এসেছেন রাজা বল্লাল। ঘুরছেন। ফিরছেন। ফুরফুর দখনে হাওয়া ঝলকে ঝলকে বইছে। ফুলে ফুলে অলির গুঞ্জরন। লতায় লতায় ভীরু দোলা। ভারি সুন্দর—মিষ্টি এই অপরাহ্নটি। দেখতে দেখতে সূর্য ডুবলো পশ্চিমে। পাতলা কালো মলমলের পর্দার মতো পাতলা পাতলা অন্ধকার গড়িয়ে পড়লো কুঞ্জবনে। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। একটু পরেই রূপালী নদীর রূপার পাত জল ঝিলমিল ক'রে উঠলো। গন্ধরাজের সাদা মুখ আরও সাদা হলো। পূব আকাশে চাঁদ উঠলো। আজ বুঝি পূর্ণিমা।

ঘুরতে ঘুরতে রাজা বল্লাল গন্ধরাজের একটি ঝাড়ের সামনে এসে দাঁড়ালেন। গন্ধরাজের ডালগুলো ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে। গন্ধ করছে ম' ম'। গন্ধের রাজা গন্ধরাজের একটি ফুল নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন রাজা বল্লাল। হঠাৎ যেন চমকে উঠলেন তিনি। তাঁর দু' চোখের বিস্ময়ভরা দৃষ্টি যেন থেমে রইলো চন্দ্রমল্লিকার কেয়ারির কাছে। একটু সরছে না।

চন্দ্রমল্লিকার পাশে দাঁড়ানো এক রমণী। সাদা সাদা চাঁদের আলোয় ফুলের সঙ্গে জ্বলছে সেই রমণীর রমণীয় মুখ। সুন্দর। আশ্চর্য সুন্দর। এ মুখ মন টানে। সারা দেহে শিহরন আনে। এ মুখের দীপ্তির কাছে আলো ঝলমল পূর্ণিমার চাঁদও বুঝি ম্লান হয়ে যায়।

মুগ্ধ বিস্ময়ে রাজা বল্লাল সেই মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। দু' ঠোঁট নড়ে উঠলো। হঠাৎ সে মুখ হেসে উঠলো। সে হাসির ঢেউ যেন বাতাস বেয়ে এসে বল্লালের বুকের মাঝখানটায় আছড়ে পড়লো।

রাজা বল্লাল কাছে গেলেন।

সে মুখের দু'টি কাজল-টানা চোখ একবার নেচে উঠেই যেন থেমে গেলো। এক আশ্চর্য স্নিগ্ধতায় সে দু'টি আবার যেন টলটল ক'রে উঠলো।

রাজা বল্লাল দেখলেন, রমণী যুবতী। ষোড়শী কি অষ্টাদশী। দেহের গড়ন পুষ্ট। বয়সের তুলনায় বাড়ন বেশী। মুখটি কোমল-কাঁচা।

'আমায় দেখে অবাক্ হলেন, না মহারাজ?' যুবতী ফুল-জড়ানো তার দীঘল বেণীটি পিঠের উপর নাচিয়ে প্রশ্ন করলে রাজা বল্লালকে। প্রশ্ন ক'রেই আবার হেসে উঠলো। হাসতে গিয়ে তার ডান গালে একটি টোল পড়লো। তাতে তাকে আরও যেন সুন্দর দেখালো।

যুবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে রাজা বল্লাল বললেন, 'তোমাকে, তোমাকে তো…'

'চিনতে পারলেন না, না মহারাজ?' হাসতে হাসতেই কথা বললে যুবতী, 'তা চিনবেন কি ক'রে? এর আগে তো আমায় কোন দিন দেখেন নি। কিন্তু আমি দেখেছি আপনাকে। দূর থেকে উঁকি মেরে দেখেছি।' বলেই হাসল যুবতী। হাসির সঙ্গে তার দীঘল দু'টি চোখের নরম নরম দু'টি কালো তারাও যেন নেচে উঠলো।

যুবতীর ব্যবহারে বিস্মিত হলেন রাজা বল্লাল। যুবতীর সঙ্গে তার কোন কালের পরিচয় নেই অথচ কতো সহজভাবে কথা বলছে সে। যেন—রাজা বল্লাল কতো তার পরিচিত। তাঁর সঙ্গে যুবতীর কতো অন্তরঙ্গতা।

'ভাবছেন, না মহারাজ?' রাজা বল্লালকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে পরনের আকাশি রঙের শাড়ির আঁচলটি তার শাঁখ-শুভ্র হাতের উপর নাচাতে নাচাতে আবার প্রশ্ন করলো যুবতী। তার চটুল দু'টি চোখের দৃষ্টি একবার রাজা বল্লালের চোখের উপর ফেলেই আবার সরিয়ে নিলে।

রাজা বল্লাল বললেন, 'হ্যাঁ, ভাবছিলাম বই কি! তুমি কে? তোমাকে তো আমি চিনিনে!'

গোলাপ পাপড়ি ঠোঁট নেড়ে আবার হাসলো যুবতী। হেসে হেসেই বললে, 'চিনবেন, চিনবেন মহারাজ। আমার পরিচয়

দিলেই চিনবেন। জাতে আমি হড্ডিকা। ছোট জাতের মেয়ে। বাপ-মা সোহাগ ক'রে নাম রেখেছেন পদ্মিনী।'

রাজা বল্লালের মুগ্ধ দু'টি চোখের দৃষ্টি পদ্মিনীর মুখের উপর। পদ্মিনী তা লক্ষ্য করলে। লক্ষ্য ক'রে মিটিমিটি হাসলো। বললে, 'আমার নাম শুনে লোকে বলে কি জানেন? বলে, পাঁকে ফুটেছে পদ্মফুল। ভাঙা ঘরে আসমানের চাঁদ। শুনে আমি হেসে হেসেই মরি। আর....আর....' পদ্মিনী আবার তার দীঘল দু'টি চোখের ঘন কালো তারা ঘুরিয়ে আনলে রাজা বল্লালের মুখের উপর দিয়ে। তার পর বললে, 'আর তা শুনে আমার হয় কি জানেন? আমার গাটা কেমন যেন গরম হয়ে ওঠে। বুকের মাঝখানটার রক্ত যেন টগবগ ক'রে জ্বলে।' বলে আবার মিষ্টি হাসি হেসে উঠলো পদ্মিনী। তার ডান গালটায় আবার একটি টোল পড়লো।

রাজা বল্লাল বললেন, 'একটা কথা বলবো পদ্মিনী?'

'বলুন মহারাজ।' পদ্মিনীর চোখে এবারে শানিত দৃষ্টি। ঝকঝকে ইস্পাতের পাতের মতো।

'যাবে আমার সঙ্গে?'

'কোথায় মহারাজ?'

'আমার ঘরে। আমার প্রাসাদে।'

'ও মা, সে কি কথা মহারাজ!' কথা বলছে আর মৃদু মৃদু হাসছে পদ্মিনী। আকাশি রঙের শাড়ির আঁচলটা দু'টি হাতে জড়িয়ে ধরছে, 'এ কি কথা মহারাজ?' চকিত বিস্ময় পদ্মিনীর কণ্ঠে, 'আপনি ঘরে নেবেন হাড়ির মেয়েকে? লোকে কি বলবে?'

'আমি জাত জানিনে, লোক মানিনে পদ্মিনী!'

'বলেন কি মহারাজ!' পদ্মিনীর দীঘল দু'টি চোখভরা বিস্ময়।

'হ্যাঁ, পদ্মিনী, আমি তোমাকে চাই। এ বুকে বড় জ্বালা, তোমায় নিয়ে সে জ্বালা জুড়োতে চাই। বলো, তুমি আমার হবে! বলো, কথা কও।' বলতে বলতে রাজা বল্লাল পদ্মিনীর শাঁখ-

শুভ্র হু'টি হাত জড়িয়ে ধরলেন। পদ্মিনী সে-হাত সরালে না। নড়ালে না। শুধু একবার তার চোখের ঘন কালো তারা হু'টিকে রাজা বল্লালের তৃষ্ণায়-ভরা হু'টি চোখের উপর তুলে ধরেই মাথা নীচু করলে।

পদ্মিনীকে নিয়ে নতুন ঘর বাঁধলেন রাজা বল্লাল। পুরনো প্রাসাদে ঠাঁই হলো না। পদ্মিনী হাড়ির মেয়ে। অন্তঃপুর থেকে তাই আপত্তি উঠলো। রাজা বল্লাল তাতে দমলেন না। পিছপা হলেন না। রূপালী নদীর তীরে পদ্মিনীর জন্যে নতুন প্রাসাদ উঠলো।

পদ্মিনীকে নিয়ে তিনি সেই প্রাসাদে গিয়ে উঠলেন।

লোকে বললে, ছিঃ ছিঃ মহারাজের একি হুর্মতি হলো গা, শেষে কিনা তিনি এক হাড়ির মেয়েকে নিয়ে মজলেন!

রাজা বল্লালের কানে গেলো সেই কথা। মন্ত্রীকে ডেকে তিনি বললেন, 'হটাও, নিন্দুকদের রাজ্য থেকে হটাও।'

প্রজাদের ঘর ভাঙলো। কেউ কেউ রাজ্য ছেড়ে পালালো। পণ্ডিতরা গোপনে সভা করলেন। হাড়ির মেয়ের ছোঁয়া খেয়েছেন রাজা বল্লাল। পুরনো প্রাসাদে ঠাঁই হলো না। নতুন প্রাসাদ করেছেন। রাজা হোন আর যা-ই হোন, সমাজে তিনি পতিত। পতিত করো তাঁকে।

রাজা বল্লাল সে-কথাও শুনলেন। শুনে মন্ত্রীকে ডাকলেন। বললেন, 'পণ্ডিতরা সব বলছে কি হে? বলছে বল্লাল সেন পতিত হয়েছে? বেশ, পতিত হোন রাজা বল্লাল। তাতে ওদের অতো মাথা ব্যথা কেন? যাও, ওদের মাসোহারা বন্ধ ক'রে দাও। রাজ্য থেকে তাড়াও।'

শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মণ সেনও পিতাকে বললেন একদিন। বললেন, 'এ হীন আচরণ রাজার শোভা পায় না, বাবা।'

শুনে জ্বলে উঠলেন রাজা বল্লাল। চোখ দু'টি পাকিয়ে বললেন, 'কোন্‌টা শোভা পায় আর কোন্‌টা শোভা পায় না সেটা আমাকেই বুঝতে দাও লক্ষ্মণ। তোমরা তাতে মাথা গলাতে এসো না।'

মনের দুঃখে লক্ষ্মণ সেন দূর দেশে চলে গেলেন। পুরনো প্রাসাদে দীর্ঘশ্বাস উঠলো। কিন্তু তা রূপালী নদীর তীর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলো না। রাজা বল্লালের বুকে একটুও ঝড় তুললো না।

রাজা বল্লালের চোখে পদ্মিনী। তাঁর মন পদ্মিনীময়।

নীল আকাশে চাঁদ ওঠে। রাজা বল্লাল পদ্মিনীর হাত ধরে কুঞ্জবনে যান। অনেক রাত পর্যন্ত সেখানে থাকেন। চাঁদ যখন মাথার উপর থেকে হাসে, তখন—সেই তখন আবার তাঁরা প্রাসাদে ফেরেন।

রাজা বল্লাল বলেন, 'পদ্মিনী! তোমার মুখটি ঠিক পদ্মফুলের মতো।'

পদ্মিনী হাসে। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে।

রূপালী নদীতে জোয়ার আসে। যৌবনের গরবে তার বুক ফুলে ওঠে। জানালায় দাঁড়িয়ে রাজা বল্লাল তাই দেখেন। পদ্মিনীকে ডেকে বলেন, 'পদ্মিনী! পদ্মিনী! এসো, এসো। ছাখো, ছাখো। রূপালী নদী কেমন ফুলছে। কেমন বাড়ছে।'

পদ্মিনী আসে। কাছে দাঁড়ায়। হাসে। রূপালী নদীর দিকে তার দীঘল দু'টি চোখের দৃষ্টি ছড়িয়ে দেয়। রূপালী নদীর ফুলে-ওঠা বুক হলুদ হলুদ রোদে ঝিকমিক করে। চিকমিক করে।

এইভাবে কাটে দিন। কাটে রাত। দিন যায়। মাস যায়।

একদিন রাত হয়েছে। নীল আকাশে চাঁদ উঠেছে। রূপালী নদীর রূপার পাত জলে চাঁদের আলো ঝলসে উঠছে। রাজা বল্লাল বাইরে বসেছিলেন।

একটি পুঁটলি হাতে পদ্মিনী সেখানে এসে দাঁড়ালো। একখানি

সামান্য সাদা শাড়ি পরনে। সারা গা অলঙ্কারহীন। মুখখানি ফ্যাকাশে। ফুলদানিতে রাখা বাসি সাদা গোলাপের মতো।

পদ্মিনীর এ রূপ দেখে চমকে উঠলেন রাজা বল্লাল। বললেন, 'পদ্মিনী, তুমি?'

'হ্যাঁ, আমি মহারাজ।' বলতে বলতে পদ্মিনী হাতের পুঁটলিটি রাজা বল্লালের সমুখে রাখলে।

রাজা বল্লাল বললেন, 'কিন্তু তোমার এ বেশ কেন পদ্মিনী?'

'এই যে আমার আসল বেশ মহারাজ। এ্যাদ্দিন যা দেখেছেন তা শুধু ছলনা।'

'ছলনা!'

'হ্যাঁ মহারাজ। আমার নাম পদ্মিনীও নয় আর আমি হাড়ির মেয়েও নই।'

'তবে—তবে তুমি কে? কে তুমি?'

আজ হাসি নেই পদ্মিনীর মুখে। হু'টি চোখ অশ্রুসজল। থেমে থেমে ধীরে ধীরে পদ্মিনী বললে, 'আমি জাতে স্থবর্ণ-বণিক। আপনারই স্বর্ণকারের মেয়ে।'

'স্বর্ণকারের মেয়ে!'

'হ্যাঁ মহারাজ। এক ব্রাহ্মণকে আপনি একটি স্বর্ণবৃষ দান করেছিলেন—মনে আছে?'

'হ্যাঁ, তা আছে।'

'সেই ব্রাহ্মণ অতিথি সৎকারের প্রয়োজনে সেই বৃষটি আমার বাবার কাছে বাঁধা রেখেছিলেন। বাবা লোভ সামলাতে পারলেন না। তিনি সোনার বৃষটি রেখে ব্রাহ্মণকে একটি পেতলের বৃষ তৈরি ক'রে দিলেন।'

'ব্রাহ্মণ বিচারপ্রার্থী হলে আমি তোমার পিতাকে সাজা দিয়েছিলাম, না পদ্মিনী?'

'বাবাকে সাজা দিয়েই আপনি থামেন নি মহারাজ। বাবার

দোষের জন্যে আপনি সমস্ত সুবর্ণ-বণিক সম্প্রদায়কে দোষী করলেন। তাদের দেওয়া-কৌলীন্য আপনি ছিনিয়ে নিলেন। পতিত করলেন তাদের।'

'হ্যাঁ, তা-ও মনে আছে পদ্মিনী।'

সেইদিনই আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আপনার কৌলীন্যের দম্ভ আমি ভাঙবো। আমি তাই করেছি মহারাজ। আপনাকে দিয়ে অনেক কুকাজ করিয়েছি। আপনাকে সমাজে পতিত করেছি। আপনাকে দিয়ে গোহত্যা, ব্রাহ্মণ হত্যাও করাতে পারতাম কিন্তু তা করাই নি। আপনি প্রাণ দিয়ে আমায় ভালোবেসেছিলেন। আর—' বলতে বলতে পদ্মিনী একবার থামলো। তার দু' চোখ বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়লো। শাড়ির আঁচলে তা মুছে নিয়ে আবার বললে সে, 'হয়তো…হয়তো কোন দুর্বল মুহূর্তে আমিও আপনাকে ভালোবেসেছিলাম।'

'পদ্মিনী! পদ্মিনী!'

'আপনার দেওয়া বস্ত্রালঙ্কার রইলো মহারাজ, আর…আর আমাকে বিদায় দিন।' আবার আঁচলে চোখ মুছলে পদ্মিনী।

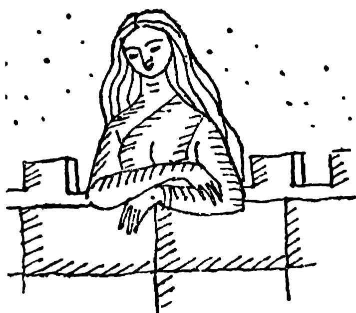
'না না, আমি অতীত জানি না, আমি শুধু পদ্মিনীকে জানি। শুধু তোমাকে জানি। অতীতকে মুছে দিয়ে তুমি আমার হও। আমার হয়ে আমার কাছে এসো পদ্মিনী।'

'না, তা হয় না মহারাজ।' বলে পদ্মিনী সেখান থেকে ছুটে পালালো। রাজা বল্লাল চীৎকার ক'রে বললেন, 'পদ্মিনী! পদ্মিনী! ফিরে এসো পদ্মিনী।'

শুধু হুহু ক'রে বাতাস বইলো। দিগন্তে সে-ডাক প্রতিধ্বনিত হলো। পদ্মিনী ফিরলো না।

পরদিন সকালবেলা রূপালী নদীতে পদ্মিনীর ফুল জড়ানো বেণী ভেসে উঠলো। রূপালী নদীর মৃদু মৃদু ঢেউ সেই বেণীকে নিয়ে খেলা করছে।

তারা ঠাকুরঝি



বড়নগরের এই জায়গাটা নিরিবিলি। ওপাশে গঙ্গা, এপাশে আমবাগ। মাঝখানে খানিকটা জমি ফাঁকা।

গঙ্গার কূলে এই নিরিবিলি জায়গাটুকুতেই চিতা সাজানো হলো। রাত ভোর ভোর। আকাশ ফর্সা ফর্সা। পূব আকাশের কপালে জ্বলজ্বলে টিপের মতো শুকতারাটা জ্বলছে।

একজন বললে, 'আর দেরি কেনে, কাজ শুরু ক'রে দে। আকাশের যে চোখ ফুটছে।'

'না, আর দেরি কি? এই তো আগুন দিচ্ছি! কই, কইরে তোরা! ইদিক্ আয়। এগিয়ে আয়। বল তবে হরি হরি!' বলে আর-একজন একগুচ্ছ শোলার মাথায় আগুন ধরালে। তার পর— এপাশ-ওপাশ ঘুরে ঘুরে চিতা জ্বালালে। চটচট ক'রে কিসের যেন শব্দ হলো। লকলক ক'রে আগুন জ্বললো! অশ্বথের পাতাগুলো উঠলো সরসর ক'রে। গঙ্গার জলে আগুনের ছায়া পড়লো। গঙ্গার জলও যেন জ্বলজ্বল করছে। জ্বলছে।

ওপাশের রাস্তা দিয়ে কারা যেন এগিয়ে আসছিল। তাদেরই একজন হেঁকে বললে, 'কে? কে গেলো হে?'

আমাদের রানীর—রানী ভবানীর মেয়ে। তারা—তারা ঠাকুরঝি।'

'ইস, অমন পুণ্যবতীর কপালে এমন দুঃখুও ছেলো গো! জীবনটাই তার পুড়ে পুড়ে গেলো। একেই বলে কপালের লেখা—'

এপাশ থেকে তার কোন সমর্থন পাওয়া গেলো না। শুধু শ্মশান-বন্ধুদের কণ্ঠের 'বলো হরি…হরি বোল' ধ্বনি বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে দূর দূরান্তে ছড়িয়ে গেলো। আর বড়নগরের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়লো একটি সংবাদ : তারা ঠাকুরঝির মৃত্যু হয়েছে।

শুনে কারো দীর্ঘশ্বাস পড়লো। কারো চোখে জল ঝরলো। একটি প্রাণের জন্যে সারা বড়নগর যেন হাহাকার ক'রে উঠলো।

একদিন বড় দুঃসংবাদ এসে পৌঁছলো নাটোরে। রানী ভবানী পূজার ঘরে ছিলেন। রাজবাড়ির এক পরিচারিকা সেখানেই ছুটে এলো। দরজার কাছ থেকে ডাকলে, 'মা—মাগো—!'

পূজায় বসেন নি রানী ভবানী। নিজ হাতেই পূজার আয়োজন করছিলেন। পরিচারিকার ডাক শুনে বললেন, 'কেরে? অমন ক'রে ডাকছিস কেন? কি হয়েছে?'

'সব্বোনাশ হয়েছে মা, খাজুরা থেকে খবর এসেছে—'

'খাজুরা থেকে? কি খবর? ওরা সব ভালো আছে তো?'

'জামাইবাবু নেই মা।'

দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন রানী ভবানী। ধপ্ ক'রে আবার বসে পড়লেন। বললেন, 'রঘুনাথ নেই? ওরে কি বলছিস তুই? কে দিলে এ খবর?'

'খাজুরা থেকে লোক এসেছে মা, সে আপনার অপেক্ষায় আছে।'

এবারে যেন জমে গেলেন রানী ভবানী। যেন পাথর হয়ে গেলেন। একটু তিনি নড়লেন না। একটু সরলেন না। স্থির দৃষ্টিতে শুধু তাকিয়ে রইলেন ঠাকুরের দিকে। দু'চোখ-ভরা জল। দু'টি ঠোঁটে মৃদু কম্পন।

আর নাটোরে মন টিকলো না রানী ভবানীর। নাটোরের আকাশ যেন জ্বলে গেছে। মাঠ যেন পুড়ে গেছে। নাটোরের বাতাস বুঝি অগ্নিক্ষরা।

আগেই দত্তক নিয়েছিলেন রামকৃষ্ণকে। এখন সে বেশ বড়-সড়ো হয়েছে। জমিদারীর কাজকর্ম বোঝে। রানী ভবানী তার হাতেই জমিদারীর ভার দিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার বড়নগরে চলে এলেন। সঙ্গে নিয়ে এলেন চোখের তারা তারামণিকে।

গঙ্গার তীরেই বড়নগর। বড় গঞ্জ। ব্যবসায়ীদের বড় বড় কারবার এখানে। রানী ভবানী এখানে মন্দির গড়লেন। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করলেন। মন্দিরময় বড়নগর যেন নতুন কাশী। রানী ভবানী বড়নগরের কোন অভাব রাখলেন না। নাটোরের মতো বড়নগরেও তাঁর দান-দাতব্যি চলতে লাগলো। কিন্তু—এখানেও ঝড় উঠলো।

একদিন। তারামণি স্নান করেছে। ভিজে চুল। খোলা। চুল শুকোবার জন্যে বড়নগরের প্রাসাদ শিখরে এসে উঠলো তারামণি। হলুদ হলুদ রোদ নেমেছে। সেই রোদে এলো চুল এলিয়ে দিলে তারামণি। সূর্যমুখী মুখ তার সূর্যের আলোতে যেন ঝিলিক দিয়ে উঠলো।

কাছেই গঙ্গা। রাজপ্রাসাদ থেকে স্পষ্ট দেখা যায়।

সেই গঙ্গার জল কেটে তখন চলছিল সিরাজের 'সখের তরণী'। সিরাজ—বাইরেই বসেছিলেন।

হঠাৎ চোখ পড়লো তাঁর রাজপ্রাসাদে। প্রাসাদ শিখরে। দৃষ্টি যেন তাঁর আটকে রইলো।

তা দেখে এক বয়স্য হাসলে। চোখ ঠারলে। বললে, 'শাহান শা কি পাখি দেখছেন?'

'না হে, না। দেখছি—মানে দেখছি—'

কথা শেষ করতে হলো না সিরাজকে। বয়স্যই কথা নিলে কেড়ে। বললে, 'না, না, না। চোখের ভ্রম। পাখি নয়, ফুলপরী।'

বয়স্যের বলবার ঢঙটি দেখে হাসি চাপতে পারলেন না সিরাজ। হেসে ফেললেন। বললেন, 'ও কাদের মেয়ে হে? রঙ দেখছি খাসা। নাক, চোখ, কান সব দেখছি যেন ছাঁচে বানানো। ও কাদের মেয়ে!'

এবারে সত্যি বিস্ময়ের ভাব দেখালে বয়স্য। চোখ ছু'টি গোলার মতো বড় ক'রে বললে, 'ও ছাই, শাহান শা দেখচি সে খবরটুকুও রাখেন না!'

'কি ক'রে আর রাখি বলো! খোদাতালা যে চোখ দিয়েছেন মাত্র ছু'টো। কানের সংখ্যাও তাই। কোন্ দিকেই বা চোখ ফেলি আর কোন্ দিকেই বা কান পাতি। কতো খবরই আর পুরে রাখি এই ছোট্ট বুকটুকুর ভেতর!' ঠোঁটের সঙ্গে সিরাজের ছু'টি চোখও যেন হাসছে।

বয়স্যটি বললে, 'এ্যাদ্দিন যা দেখেন নি, এবারে তো তা দেখছেন—বলি কি একেবারে ছু'টি চোখ ভরে দেখছেন!'

'দেখচি? কই দেখচি না তো।' একটু রহস্য ক'রে বললেন সিরাজ।

'ঐ যা—চলে গেছে? সরে পড়েছে? তা সরুক আর পড়ুক। চোখে দেখচি নে সত্যি কিন্তু মনে দেখেচি তো?—ঐ যা, কি বলতে আবার কি বলে ফেলেছি। কোথায় বলবো শাহান শা দেখচেন তো, তা না বলে হারাম মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে আমি দেখচি তো। তোবা···তোবা···' বলে বয়স্য একটা অদ্ভুত মুখভঙ্গী করলে। বার ছু'তিন নাক কান মুললে। তার পর বললে, 'ঐ যে মেয়েটি দেখলেন, ওটি হলো রানী ভবানীর বিধবা মেয়ে, তারামণি। লোকে সোহাগ ক'রে ডাকে: 'তারা ঠাকুরঝি'।

'বিধবা?' একটু যেন বিস্মিত হলেন সিরাজ।

বয়স্য বললে, 'অবাক্ হলেন শাহান শা? অমন রূপ, অমন যৌবন বিফলে যাবে বলে? কিন্তু হিঁছুদের ঐ এক রীতি শাহান শা, স্বামী

মলো তো স্ত্রী হলো ব্রহ্মচারিণী। কিন্তু স্বামীর বেলায় ওটি নয়। স্ত্রী মরেছে? তা ভাবনা কেন, একটা ছাড়া পাঁচ-পাঁচটা স্ত্রী গেঁথে নাও। কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু স্ত্রীর বেলায়? স্ত্রীর বেলায় ওটি হবার উপায় নেই। তুমি দ্বাদশী হও আর চতুর্দশী হও। তাতে কিছু আসে যায় না। তোমার রূপ যৌবন সব কিছু চেপে রেখে তোমাকে বৈরাগিণী হতে হবে। ঐ যে তারামণিকে দেখলেন? সেও হয়েছে সন্ন্যাসিনী। বুকের বাসনাকে তিল তিল ক'রে চেপে মারছে।'

'কিন্তু কদ্দিন পারবে এভাবে চেপে রাখতে?' প্রশ্ন করলেন সিরাজ।

'যদ্দিন ও-দেহ কয়লা না হয়। মাটির সঙ্গে না মেশে।'

সিরাজ বললেন, 'কিন্তু তারাকে যে আমার চাই। অমন রূপ··· অমন যৌবন আমি থাকতে ব্যর্থ হবে, কি ক'রে তা সইবো! বলো, তাকে পাবো না? তারার আলোয় আমার মহল রাঙা হবে না?'

এবারে বয়স্য একটু হাসলে। সিরাজের চোখের উপর দিয়ে তার দু'টি পাকা চোখ ঘুরিয়ে আনলে। তার পর বললে, 'কি যে বলেন শাহান শা, আপনি তাকে পাবেন না কি, একবার মন করলেই পাবেন।'

'পাবো? তুমি বলচো পাবো?'

'হ্যাঁ, পাবেন। তবে একটু চেষ্টা করতে হবে। এই ধরুন ক্ষেতে জল আনতে হলেও খাল কাটাতে হয়। সেইরকম একটা ব্যবস্থা ক'রে তারামণিকেও টেনে আনতে হবে।'

'তুমি তো বললে, কিন্তু তারামণিকে টেনে আনি কি ক'রে? দাদু যে রয়েছেন, তিনি যে তা হলে রেগে আগুন হয়ে উঠবেন।'

'তা ঠিক হবে—সবই ঠিক হয়ে যাবে।' বলে ফিকফিক ক'রে হাসলে বয়স্য।

কানে কানে কথা ছড়ায়। কথা গড়ায়, সে কথা গড়িয়ে গড়িয়ে রানী ভবানীর কানেও এলো। তিনি শুনলেন সিরাজের মতলবের কথা। শুনে চমকে উঠলেন। আঁতকে উঠলেন। কোথায় নাটোর আর কোথায় বড়নগর! এখানে তাঁর লোক কোথায়।'

রানী ভবানী চিন্তায় পড়লেন।

বড়নগরের ওপারে সাধকবাগ। সাধকবাগে মস্তারাম বাবাজীর আখড়া। রামোপাসক পরম বৈষ্ণব তিনি। রানী ভবানীর গুণগ্রাহী। তাড়াতাড়ি তাঁকেই ডেকে পাঠালেন রানী ভবানী। খুলে বললেন তাঁর বিপদের কথা।

বললেন, 'তা হলে আমি কি করি গোসাঁই!'

মস্তারাম বাবাজী একটু ভাবলেন। এক মাথা সাদা চুলে হাত বুলোলেন। তার পর বললেন, 'কি আর করবে মা? কোথায় যাবে এ অসময়ে। যাওয়ার পথেই যদি তারা এসে পড়ে?'

'আমি যে ভেবে কিছুই স্থির করতে পারছি নে গোসাঁই।

'আর ভেবে কি হবে মা! প্রভুজী বলেছেন, অন্যায়ের প্রতিবাদ করো। প্রতিরোধ করো। আমাদেরও তাই প্রতিরোধ করতে হবে।

'কি দিয়ে প্রতিরোধ করবো আমি? আমার সে-জনবল কই?'

'প্রভুজী করাবেন মা, আমি তুমি নিমিত্ত মাত্র। তোমার জনবল না থাক, আমার আছে। আমার আখড়ায় বৈষ্ণব ভক্তেরা আছেন। অন্যায়ের প্রতিরোধে প্রয়োজনে তাঁরা প্রাণ দেবেন।'

মস্তারাম বাবাজীর কথায় ভরসা পেলেন রানী ভবানী। তাঁর জল ছলছল চোখ এবার যেন জ্বলে উঠলো। বললেন, 'আসবেন? আমার বিপদে তাঁরা এগিয়ে আসবেন?'

'প্রভুজী আনাবেন মা, তাঁর রাজ্যে কি এত বড় অনাচার কোন দিন ঘটতে পারে।' বলে মস্তারাম বাবাজী প্রভুর উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন।

কিছুক্ষণ পরেই বৈষ্ণবেরা গঙ্গা পাড়ি দিয়ে এলেন। হাতে আর

মালা নেই। হাতে হাতে অস্ত্র-শস্ত্র। মুখে মুখে জয় রামজী···জয় রামজী···ধ্বনি। তাঁরা এসে রানী ভবানীর প্রাসাদ ঘিরে রইলেন।

কিন্তু এলেন না সিরাজ। তারা হরণে এলো না তাঁর লোকজন। হয়তো মস্তারাম বাবাজীর কথা তিনি শুনেছেন। হয়তো বুড়ো নবাব—আলিবর্দির চোখ রাঙানিকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি। যে রূপ—চোখে দেখে তিনি পাগল হয়েছিলেন, একদিন সে-রূপকে আবার ভুলে যেতে হলো।

কিন্তু সিরাজের কথা ভুললেন না রানী ভবানী। যে সাপ এবারে ফণা গুটালো হয়তো একদিন আবার সে ফণা তুলবে। তাই সবার অজান্তে তারামণিকে সঙ্গে নিয়ে একদিন তিনি বারাণসী রওনা হলেন। বড়নগরে তারার মৃত্যু সংবাদ রটনা হলো। বড়নগরের লোক যখন জানলে তারা ঠাকুরঝি মরেছেন, শ্মশান-বন্ধুরা তাঁর শেষ কাজ ক'রে ফিরলো—তারামণি তখন বারাণসীর পথে।

রূপের তৃষ্ণা



বড় সাধ ক'রে নাত-বৌ ঘরে আনলেন ফতেচাঁদ। 'জগৎ শেঠ' ফতেচাঁদ। নাতি মহাতপ রায়ের কোমল চিবুকটি একটু নাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'কেমন রে, বলি কেমন?' মহাতপ কথা কইলেন না। দাদুর চোখে চোখ রেখে একবার শুধু সে হেসে উঠলো। গাল দু'টি তার নেচে উঠলো। ভোরের নরম রোদের মতো একটি পাতলা পুলকের রঙ লাগলো তার মুখমণ্ডলে।

ফতেচাঁদ বললেন, 'বলেছিলুম না, চোখ জুড়িয়ে যাবে। সাত রাজ্যি ঘুরে কনে ঠিক করেছি—তার রূপের রোশনাই-এ ঘর-দোর সব আলো ক'রে দেবে না!' বলতে বলতে রহস্যভরা দু'টি চোখ মহাতপের মুখের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনলেন ফতেচাঁদ।

মহাতপ হাসছে। কোঁচার খুঁটটি হাতে নাচাতে নাচাতে হাসছে। ফতেচাঁদ আবার বললেন, 'কি রে, আমার নাত-বৌকে দেখে থমকে গেলি নাকি! তার রূপের ঠমকে চমকে উঠলি নাকি। তা এক-আধটু যাবি বই কি! ও কি আর যেমন-তেমন রূপ রে, একেবারে যাকে বলে রূপের আগুন।' বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠলেন ফতেচাঁদ। হাসলে মহাতপও। হাসতে হাসতেই সে দাদুর সমুখ থেকে পালিয়ে গেলো।

হ্যাঁ, ফতেচাঁদ বেশী বলেন নি। বাড়িয়ে বলেন নি। গর্ব করবার মতোই নাত-বৌ এনেছেন তিনি। ছিমছাম গড়ন। দুধ-আলতা রঙ। সবচেয়ে অপরূপ হলো তার দীঘল দু'টি চোখ। সে চোখের দৃষ্টি স্নিগ্ধ। মায়াময়। মোহময়।

ঐ চোখ দেখেই চোখে লেগেছিল ফতেচাঁদের। অনেকক্ষণ তাকিয়েছিলেন তিনি সে-চোখের দিকে।

বলেছিলেন, 'সুন্দর! শ্রীময়ী, লক্ষ্মী মা তুমি!'

লজ্জায় মেয়েটির ডুগডুগে মুখ আরও যেন লাল হয়ে উঠেছিল। সে তার চুল ছড়ানো মাথাটা নীচু ক'রে নিয়েছিল।

ফতেচাঁদ তাঁর কালো চুলের অরণ্যে হাত বুলোতে বুলোতে বলেছিলেন, 'বাঃ, সুন্দর! সুন্দর অলকদাম। ঐ যে কি বলে না, যেন শ্যাম কজ্জল মেঘ।' বলতে বলতে নিজেই হেসে উঠেছিলেন ফতেচাঁদ। পার্শ্বচরের পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন, 'আর দেখবো কি হে? আর বলবো কি হে? এ কাজ হবে। তুমি কথা দিয়ে দাও।'

পার্শ্বচর একটু দ্বিধা করেছিল। বলেছিল, 'সবই তো বুঝলুম শেঠজী, কিন্তু বয়েসটা যে বড় কম। মনে হয় এগারো-বারোর বেশী হবে না।'

শুনে যেন ভেংচে উঠেছিলেন ফতেচাঁদ। বলেছিলেন, 'আমার মহাতপ কতো বড়টি হে? সে কি একেবারে পেকে গেছে নাকি? সে কি কাঁচা নয়? একেবারেই যে কাঁচা সে। আরে, কাঁচায় কাঁচায় মিলবে ভালো। কাঁচাই তো সাচা। তুমি কথা দিয়ে দাও। এ কাজ আমি করবো।'

সেই কনেকেই ঘরে আনলেন ফতেচাঁদ।

লোকে বললে, 'না, শেঠজীর পছন্দ আছে বটে। আলোর টুকরো বৌ এনেছেন ঘরে। বৌ নয় তো যেন অপ্সরী!'

সে-কথা শুনে কান জুড়ায় ফতেচাঁদের। প্রাণ জুড়ায়। মহাতপকে কাছে ডেকে আবার রসিকতা করেন তিনি, 'কি? লোকে বলছে কি?'

মহাতপ শুধু হাসে। শুধু হাসে।

ফতেচাঁদ বলেন, 'লোকে বলছে নাত-বৌ আমার অপ্সরী। ডানাকাটা পরী। বলি এ মুক্তোমালা তোর গলায়—'

কথা শেষ করতে পারেন না ফতেচাঁদ। মহাতপ সেখান থেকে হাসতে হাসতে চলে যায়।

তা দেখে ফতেচাঁদও হোঃ হোঃ ক'রে হেসে ওঠেন।

মুর্শিদাবাদের মসনদে তখন সরফরাজ। নবাব। নবাবদের সঙ্গে শেঠদের মাখামাখি। শেঠদের সোনায় নবাবরা কেনা। বুদ্ধি-পরামর্শ সব কিছু তাঁদের শেঠদের সঙ্গে।

ফতেচাঁদের নাত-বৌ'র কথা সরফরাজও একদিন শুনলেন। শুনলেন, রূপবতী বৌ এনেছেন ফতেচাঁদ। তেমন রূপ নাকি তামাম মুর্শিদাবাদে কারো নেই। রূপের আলো যেন ঠিকরে পড়ে। যে দেখে সে-ই বিস্মিত হয়।

সরফরাজেরও বড় সাধ হলো, সাধ হলো—ফতেচাঁদের নাত-বৌকে তিনি দেখবেন। যে রূপের রোশনাই সবার চোখে তাক লাগিয়েছে সে-রূপকে একবার তিনি পরখ করবেন।

কথায় কথায় কথাটা একদিন ফতেচাঁদকে জানালেন সরফরাজ।

শুনে মাথাটা চন্ ক'রে উঠেছিল ফতেচাঁদের। দু'টি চোখ দপ্ দপ ক'রে উঠেছিল। দু'টি চোখে একটা তীব্র জ্বালা জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু না। একেবারে জ্বলে উঠলেন না ফতেচাঁদ। ক্রোধের যে স্ফুলিঙ্গ দু'টি চোখে দাপিয়ে উঠেছিল তিনি তাকে হঠাৎ নিবিয়ে দিলেন। তাঁর সারা গায়ে যে কম্পন শুরু হয়েছিল হঠাৎ যেন তা থেমে গেলো। কণ্ঠটা অদ্ভুত মোলায়েম ক'রে ফতেচাঁদ বললেন, 'ওটা কি কথা বললেন জাহাঁপনা!'

'কেন, চাঁদ কি তোমার একার ফতেচাঁদ ?'

'না, তা হবে কেন ? তবে—'

'চাঁদ নয়, নারী। আলো নয়, রূপ। তাই তো ?'

ফতেচাঁদ মাথা নীচু করলেন।

'অতো রূপ তোমার ঘরের দেয়াল দিয়ে ঢেকে রাখবে কেন ফতেচাঁদ ? দেয়াল ভেঙে দাও। রূপের রোশনাই বাইরে আসুক। চাঁদের আলো আর নারীর রূপ কারো একার নয়। ও সবার। জগতের।' বলতে বলতে বাঁ চোখটা একটু ছোট হয়ে এলো সরফরাজের। দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ ক'রে উঠলেন তিনি। দু'পা হাঁটলেন। হঠাৎ আবার থমকে দাঁড়ালেন। মুখ ফেরালেন। ফতেচাঁদের কাছে এলেন। বললেন, 'যে রূপকে তুমি ঘরে ঢেকেছো, সে-রূপকে আমি দেখতে চাই। এ আমার সাধ। এ আমার তৃষ্ণা।' বলতে বলতে শরীরটা থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো সরফরাজের। মুখমণ্ডলটা লাল হয়ে উঠলো। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিলো।

ফতেচাঁদ বললেন, 'সে কি সম্ভব জাহাঁপনা ?'

'কেন সম্ভব নয় ফতেচাঁদ।'

'আমরা হিন্দু। হিন্দু নারীর সতীত্ব মৃৎ পাত্রের মতো। একবার ভাঙলে আর জোড়া লাগে না।'

'সতীত্ব ! তুমিও আজকাল সতীত্বের কথা বলছো নাকি ফতেচাঁদ। তুমিও আখড়ার গোসাঁই হলে নাকি ?'

আবার সেই হাসি সরফরাজের। হোঃ হোঃ করা বিকট হাসি। তাঁর লাল লাল দু'টি চোখও নেচে উঠলো সে-হাসির সঙ্গে। ফতেচাঁদের গা জ্বলছে। বুক জ্বলছে। দু'টি কান যেন ঝনঝন করছে। তিনি আর দাঁড়ালেন না। সোজা পা বাড়ালেন বাড়ির দিকে।

সরফরাজ আবার যেন জোর ক'রেই হেসে উঠলেন।

বিকেলে লোক গেলো। দলবল গেলো ফতেচাঁদের বাড়িতে। ফতেচাঁদ জানলা দিয়ে তা দেখলেন। দেখে পাগলের মতো ছুটে গেলেন মহাতপের ঘরে।

'মহাতপ। মহাতপ। নাত-বৌ।'

মহাতপ ঘরেই ছিল। মধ্যাহ্নভোজনের পর বিশ্রাম করছিল। দু'টি চোখে ঘুমের আমেজ। সারা দেহে ক্লান্তির আবেশ। কিন্তু ফতেচাঁদের ডাকে ঘুম ছুটলো তার। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠলো মহাতপ। বললো, 'দাদু!'

'ওরে সব্বোনাশ হয়েছে রে মহাতপ! নবাব তাঁর লোকজন পাঠিয়েছেন—'

'নবাব? সরফরাজ খাঁ? কেন?' উৎকণ্ঠার সুর মহাতপের কণ্ঠে।

ফতেচাঁদ এদিক্-ওদিক্ চাইলেন। কাকে যেন খুঁজলেন। দেখলেন ঘরের এক কোণে নাত-বৌ দাঁড়িয়ে আছে। মুখটি ঘোমটায় ঢাকা। ফতেচাঁদ তার কাছে গেলেন। তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'এ আকাশের চাঁদকে কোথায় আমি লুকিয়ে রাখি রে, মহাতপ? কোথায় আমি লুকিয়ে রাখি?'

মহাতপ নিশ্চুপ। দু'টি চোখে তার তীব্র জ্বালা। সে ভাবছে। রাগে কাঁপছে।

শেষ রক্ষা হলো না। নাত-বৌকে ধরে রাখতে পারলেন না ফতেচাঁদ। ওরা এসে কেড়ে নিয়ে গেলো। ফতেচাঁদ বাধা দিয়েছিলেন। মহাতপও ক্ষেপে উঠেছিল। এক মুঠো গোলাপ ফুলের মতো ছোট্ট বালিকা চীৎকার করেছিল।

কিন্তু না। কিছুই হলো না। কোন বাধাই টিকলো না। যাকে ওরা নিতে এসেছিল তাকে নিয়ে তারা চলে গেলো। মণিহারা সাপের মতো মাটিতে পড়ে রইলেন ফতেচাঁদ। পড়ে রইলো মহাতপ।

তাঁদের চোখের সমুখ দিয়েই একখানি শিবিকা নবাব প্রাসাদের দিকে রওনা হলো।

বাইরের সাজঘরে অপেক্ষা করছিলেন নবাব। সরফরাজ। প্রহর গুণছিলেন। পশ্চিম আকাশটাকে লালে লাল ক'রে দিয়ে সূর্য ডুবলো। ধীরে ধীরে পাতলা অন্ধকার নামলো। গাছ-গাছালির মাথাগুলো যেন জড়িয়ে নিলো কালো সিল্কের ওড়না।

দরজায় দাঁড়িয়ে সবই দেখলেন সরফরাজ। দেখলেন রূপবতী পৃথিবী যেন চোখ বুজলো। কালোর কলঙ্ক যেন তাকে ঘিরে ধরলো। নবাব সরফরাজ যেন চীৎকার ক'রে উঠলেন, 'রোশনাই, রোশনাই ক'রে দে। আলো জ্বেলে দে।'

আলো জ্বললো। সাজঘরের দেয়ালের আয়নাগুলোতে সে আলো যেন ঝাঁপিয়ে পড়লো।

সরফরাজ যেন শ্বাস ছেড়ে বাঁচলেন। তাঁর বুক থেকে একটা কাঁটা যেন সরে গেলো। তিনি আবার দ্রুত পায়চারি শুরু করলেন।

'জাহাঁপনা!'

'কে? কে কথা কইলো?'

'আমি। আমি জাহাঁপনা। আমি জগৎ শেঠের নাত-বৌ।'

চমকে উঠলেন নবাব সরফরাজ। থমকে দাঁড়ালেন। দেখলেন, সাজঘরে এলো ছোট্ট একটি বালিকা। রূপবতী। চুল এলোমেলো। চোখে জল। যেন অনেক ঝড় আর বৃষ্টি পেরিয়ে এসেছে সে। কাঁপছে।

হঠাৎ যেন কি হলো সরফরাজের। ছ'টি চোখে হাত চাপা দিলেন তিনি। আবার চীৎকার ক'রে বললেন, 'ওরে কে আছিস? কে আছিস? রোশনাই বন্ধ কর। আমার রূপের তৃষ্ণা মিটেছে রে, আলো নিবিয়ে দে। স-ব আলো নিবিয়ে দে।'

বলতে বলতে একটা আরাম কেদারায় ধপ ক'রে বসে পড়লেন সরফরাজ।

চীৎকার শুনে ছুটে এলো লোকজন। কেউ কেউ ডাকলেন, 'জাহাঁপনা!'

'ওরে ফিরিয়ে দিয়ে আয়, ফিরিয়ে দিয়ে আয়। যার বুকের ধন কেড়ে এনেছিস, তার বুকে আবার ফিরিয়ে দিয়ে আয়।' উত্তেজনায় সরফরাজ আবার দাঁড়িয়ে উঠলেন। লোকজনেরা হতবাক্ হয়ে চেয়ে রইলো।

আবার শিবিকা ছুটলো। নবাব-প্রাসাদ থেকে শেঠের কুঠিতে। এবারে অন্ধকার কেটেছে। আকাশে চাঁদ উঠেছে। গাছ-গাছালির পাতায় পাতায় আলোর চন্দন।